পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬২ বর্ষ ❑ ১ম সংখ্যা

১৫ জুলাই, ১৯৯৯ ঈসাব্দ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ,
খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এইরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এইরূপ সত্য কথা যে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমন কি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তেকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তেকাফ যে–
ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;
খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ করতে পারেন এবং
গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মধ্যে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড়-পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এইরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগৎ বলবে ভুল– আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাঁড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি এই কথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি ইহা বিশ্বাস করেন যে, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয় নি, সে আদৌ পরিশ্রম করে নি।

আপনি যদি এইরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মোবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে উহা পুনরায় সজীব হবে।

বয়াতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

আল্লাহ্তাআলা প্রত্যেক নবী-রসূলের কাছ থেকে 'মিসাক' বা অঙ্গীকার নিয়েছেন। নবীরাও তদনুযায়ী প্রত্যেকে তাঁদের স্ব স্ব অনুসারীদের কাছ থেকে ওয়াদা ও অঙ্গীকার নিয়েছেন বয়াতের আকারে। বয়াতের শর্তাবলী পালনের মধ্যেই অনুসারীদের জীবনের সফলতা ও সার্থকতা।

আল্লাহ্তাআলা কুরআন করীমে বলেছেন-ইন্নাল আহদা কানা মাসউলা অর্থাৎ নিশ্চয় প্রত্যেক ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। বর্তমান যুগে আমরাও যুগ-ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আলায়হেস সালামের সাথে ১০টি শর্ত পালন করার ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতিতে তাঁর নিকট বয়াত হয়েছি। কেবল মাত্র মৌখিক বয়াতের কোন মূল্য নেই। বয়াতের শর্তানুযায়ী নিজেদের জীবনকে পরিচালিত না করলে আমরা সকলেই যে জিজ্ঞাসিত হবো সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বার বার বয়াতের শর্তানুযায়ী চলার জন্যে তাঁর (আঃ) জামাতের লোকদের তাগিদ দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

"বয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা উচিত এবং ইহার অনুগমন করা উচিত। বয়াতের তাৎপর্য ইহাই যে, বয়াতকারী তাহার মধ্যে সত্যিকারের পরিবর্তন এবং নিজ হৃদয়ে খোদা-ভীতি সৃষ্টি করিবে এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য জানিয়া নিজের জীবনকে একটি পবিত্র নমুনা সৃষ্টি করিয়া দেখাইবে। যদি এইরূপ না হয় তবে বয়াতে কোন লাভ নেই; বরং এই বয়াত তাহার জন্য আরো আযাবের কারণ হইবে। কেননা, অঙ্গীকার করার পর জানিয়া বুঝিয়া ও স্বজ্ঞানে নাফরমানী করা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক" (মলফুযাত, দশম খন্ড, পৃঃ ৩৩৪)।

আমাদের প্রত্যেকের আত্ম-বিশ্লেষণ করা দরকার আমরা কি আমাদের বয়াতের শর্তাবলীর মাপকাঠিতে যোগ্য বলে গণ্য হবো। আমরা সারা দিনের কর্মক্লান্ত দেহ যখন বিছানায় এলিয়ে দেই তখন কি আমরা ভেবে দেখেছি যে, আজ সারাদিন আমরা যে কাজগুলো সম্পাদন করেছি তা কি বয়াতের শর্তাবলীর কষ্টিপাথরে সঠিক বলে বিবেচিত হবে ? আমরা কি ভেবে দেখেছি যে, আমাদের যত কর্মকান্ড–'ম্যায় দিন কো দুনিয়া পর মুকাদ্দম রাক্ষুঙ্গা' অর্থাৎ আমরা ধর্মকে দুনিয়ার ওপরে প্রাধান্য দেবো-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যথার্থ হয়েছে ? যদি না হয়ে থাকে তাহলে এখনই আমাদের শুধরিয়ে নেয়া দরকার। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বেই শুধরানোর প্রকৃষ্ট সময়। যখন মহামূল্যবান প্রাণ বায়ু ঝড়ের পাখীর ন্যায় নীড় ছাড়তে বাধ্য হবে তখন আর শুধরানোর সময় থাকবে না। সেই মহা যাত্রার পূর্বে আমাদের দেখে নেয়া দরকার, আমাদের গাটরী-বোচ্কাগুলো কি প্রয়োজনীয় জিনিষ দ্বারা পরিপূর্ণ নাকি এমন কতকগুলো বেহুদা জিনিস দ্বারা পরিপূর্ণ যা মহারাজাধিরাজের দরবারে প্রত্যাখ্যাত হবে। আমাদের যে কড়ায়-গন্ডায় হিসাব মিলিয়ে দিতে হবে। ওয়াদাগুলো ঠিক-ঠাকভাবে পালন করেছি কিনা সে জবাব দিতে হবে। সে দিন আসার পূর্বে আমরা যেন নিজেরাই একবার হিসাব মিলিয়ে নেই নচেৎ আল্লাহ্র দরবারে আমরা মুখ দেখাবো কোন সাহসে !

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬২ বর্ষ ॥ ১ম সংখ্যা

৩১ আষাঢ় ১৪০৬ বঙ্গাব্দ ৩০ রবিউল আউঃ ১৪২০ হিঃ কাঃ
১৫ ওয়াফা ১৩৭৮ হিঃ শাঃ ১৫ জুলাই ১৯৯৯ ইসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

সম্পাদক
মকবুল আহমদ খান

সহকারী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহ উদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মদ শামসুর রহমান

সহকারী হিসাব ব্যবস্থাপক
গিয়াসুদ্দীন আহমদ

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	–	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	–	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	–	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	–	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	–	জার্মানী
কাউসার আহমদ	–	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	–	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	–	জাপান
মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম	–	হংকং
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	–	নিউজিল্যান্ড

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬৩৪১৪

সম্পাদকীয়

দাওয়াত ইলাল্লাহ্-একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য

দাওয়াত ইলাল্লাহ্র (আল্লাহ্র দিকে আহ্বান) গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য আহমদী মাত্রই অবগত আছেন। ইহা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম যা সর্বদা ঐশী জামাতের জীবন ও স্থিতির কারণ হয়ে থাকে। ইহা এমন একটি পথ যা মানব-সম্প্রদায়কে শান্তি ও ঐক্যের মঞ্জিলে পৌছে দেয়। কল্যাণ ও উপকারের ইহা একটি মাধ্যম। ইহা সর্বপ্রকার অনিষ্ট ও অকল্যাণকে দূরীভূত করে। আসলে ইহা স্থায়ী জীবনের বারি-বিশেষ।

প্রত্যেক আহমদী ছোট-বড় যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে প্রত্যেক স্তরের পেশার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি দাওয়াত ইলাল্লাহ্র এই গুরুত্ব সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং এ সাধনায় নিয়োজিত। এজন্যে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র।

প্রত্যেক হৃদয়ে এই আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় যেন তার নাম অক্ষয়-অমর হয়ে থাকে এবং এ বিষয়টি দাওয়াত ইলাল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত। আর ইহাই ঐ গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন যার প্রতি আমাদের মহান ইমাম সাইয়্যেদনা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ) দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি ১৯৯২ সনের ১৩ই মার্চের জুমুআর খুতবায় বলেন ঃ

"দাওয়াত ইলাল্লাহ্ আপনাদের প্রত্যেককেই জীবিত করতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তি দাওয়াত ইলাল্লাহ্র বিষয়টি উপলব্ধি করতঃ যদি এর করণীয় কাজকে সমাধা করেন তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তি ওলী (আল্লাহ্র বন্ধু) হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। দাওয়াত কেবল অন্যান্যদেরকেই খোদার নিকটবর্তী করবে না বরং আপনাকেও খোদার অধিকতর নিকটবর্তী করতে থাকবে এবং জামাতের মধ্যে অধিক সংখ্যায় আওলীয়া সৃষ্টি হবে।"

তিনি ১৯৯৮ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী একটি সুসংবাদ দিতে গিয়ে সফলতার বরমাল্য লাভের পদ্ধতি সম্বন্ধে বলেন ঃ

"যারা দাওয়াত ইলাল্লাহ্র কাজ করেন আমি তাদের সুসংবাদ দিচ্ছি যে, যখন কাউকে জীবন দান করবে তখন খোদাতাআলা একটি জীবন দান করবেন এবং ইহা এমন একটি প্রবহমান কল্যাণ-ধারা যা কখনও নিঃশেষ হতে পারে না . . . . এজন্যে দাওয়াত ইলাল্লাহ্-এর কাজ করেন এমন প্রত্যেক ব্যক্তির চেষ্টা করা উচিত যেন দোয়া করতে করতে এ প্রচেষ্টাকে সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যান এবং নিজের আধ্যাত্মিক ফল-ফলাদি স্বীয় চোখে অবলোকন করেন, উহার আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হন এবং পরে উহাকে প্রদীপে পরিণত করেন; এমন প্রদীপে যা অন্যান্য প্রদীপগুলোকে জ্যোতির্ময়কারী প্রদীপে পরিণত করে।"

আজ আহমদীয়া জামাতের যুবক-বৃদ্ধ, ছোট বড় প্রত্যেক নর ও নারী, প্রত্যেক পেশা ও পর্যায়ের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি মানব-মন্ডলীর প্রেমে বিহ্বল হয়ে দাওয়াত ইলাল্লাহ্র কাজে নিমগ্ন আছেন। আবার স্বীয় নিশি প্রহরের দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্র আস্তানায় নিপতিত যেন তাঁর সৃষ্টি সঠিক পথ লাভ করে এবং বিশ্বে আধ্যাত্মিক বিপ্লব জাগরিত হয়। এ বিপ্লবকে চিহ্নিত করে আমাদের প্রিয় ইমাম (আইঃ) এভাবে বলেন ঃ

"মনে হয় যে, খোদার অমোঘ নিয়তি খুব তীব্র বেগে আহমদী জামাতকে এ বিশ্ব-বিপ্লবের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ইহাকে আনয়ন করা আমাদের সাধ্যাতীত। কিন্তু ইহা খোদার অমোঘ-নিয়তি ও তাঁর শক্তি ও মাহাত্ম্যের অধীন। আর নতুন শতাব্দীতে প্রবেশ করার আগেই খোদা আহমদী জামাতের উন্নতির মহান দারোদ্‌ঘাটন করতে ইচ্ছা করেন (খুতবা জুমুআ, ১১ই এপ্রিল, ১৯৮৭ সন)।

দাওয়াত ইলাল্লাহ্, প্রকৃতপক্ষে ঐশী-প্রেমের একটি মাধ্যম। আল্লাহ্তাআলার ভালবাসা, সন্তুষ্টি ও রেযামন্দি লাভ দাওয়াত ইলাল্লাহ্-এর মাধ্যমে সম্ভব। এর মধ্যেই মানব-গোষ্ঠির জীবন এবং একজন দাঈ ইলাল্লাহ্-এর অমর জীবনের রহস্য নিহিত। ইহাই সেই ভালবাসা যা আল্লাহ্তাআলার খাতিরে মানব-গোষ্ঠির প্রতি হওয়া আবশ্যক, যেন তার প্রকৃত দাসে পরিণত হয়ে ঐশী আস্তানায় বিনত হয়।

হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন,

হাস্ত জামে ইশ্‌কে উহ্ আবে হায়াতে লাজওয়াল।
হারকে নওশীদ আস্ত হারগিয্ নামীবদ বাদ আযি।

"বারীতাআলার সত্তার প্রতি ভালবাসা ও প্রেমের পান-পাত্র হলো অমর জীবনের বারি, যে ইহা পান করেছে সে অবশ্যই মরবে না, বরং চিরস্থায়ী জীবন লাভ করবে।"

দাওয়াতে ইলাল্লাহ্র আরম্ভ ও শেষ আমাদের রাত্রি জাগরণের মধ্যে নিহিত। জাগরণ এবং এর মধ্যে ঐ ব্যথাপূর্ণ দোয়া। এতদ্দ্বারা চেষ্টা-প্রচেষ্টার প্রস্রবণ প্রস্ফুটিত হয়ে থাকে এবং কথায় ঐশী কল্যাণ অবতীর্ণ হয়। সুতরাং কর্ম-ক্ষেত্রে দাওয়াত ইলাল্লাহ্র জন্যে ব্যথিত অন্তরে হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এ দোয়া করা উচিত যেন নিয়তির অমোঘ লিখন পরিপূর্ণ হয় ঃ

রব্বিনকুখ রূহা বারাকাতিন ফী কালামী হাযা ওয়াজআল আফইদাতাম্মিনান্ নাসি তাহবী ইলায়হে অর্থাৎ হে আমার প্রভু ! আমার এ কথায় কল্যাণের আত্মা ফুঁকে দাও এবং লোকদের হৃদয় এমন করে দাও যেন উহার প্রতি ঝুঁকে।

(জুন '৯৯ এর মাসিক আনসারুল্লাহ্র সম্পাদকীয়-এর বঙ্গানুবাদ)

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃঃ
❑ কুরআন মজীদ ঃ	ঃ 'কুরআন মজীদ' থেকে	৩
❑ হাদীস শরীফ ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক	ঃ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা - মাওলানা সালেহ আহমদ	৩
❑ অমৃত বাণী ঃ অহংকার হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)	ঃ অনুবাদ – জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া	৪–৫
❑ তৌযীহে মরাম (লক্ষ্য-বস্তুর বিশ্লেষণ) ঃ মূল–হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)	ঃ অনুবাদ – জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া	৬
❑ জুমুআর খুতবা ঃ আয়াতুল-কুর্সির মাহাত্ম্য ও গভীর তাৎপর্য হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আঃ)	ঃ অনুবাদ–মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	৭–১২
❑ জুমুআর খুতবা ঃ আহমদী শহীদগণের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের পাতা থেকে হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আঃ)	ঃ অনুবাদ – মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	১৩–১৬
❑ উটেচড়া নবী চাঁদেচড়া মানুষ	ঃ জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	১৬–১৮
❑ ইসলামের খেদমতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)	ঃ মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	১৯–২৩
❑ কাশ্মীরের কার্গিল-এর অত্যাশ্চার্য ঘটনাবলী মূল জুবাইর খলীল খান, জার্মানী	ঃ অনুবাদ-জনাব নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী	২৩
❑ 'কেদরের সমস্ত প্রতাপ লুপ্ত হবে' (দুই)	ঃ জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২৪–২৫
❑ কাদিয়ান – দারুল আমান	ঃ অনুবাদ – জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া	২৬–২৭
❑ ছোটদের পাতা ঃ চশমা যমযম (যমযমের প্রস্রবণ) মূল ঃ মিসেস বুশরা দাউদ	ঃ পরিচালক-জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২৭–২৯
❑ ইসলামের বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব	ঃ জনাব সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী	৩০-৩১
❑ সহস্র সহস্র মুসলমান আহমদীয়ত গ্রহণ করেছে কেন ?	ঃ অনুবাদ ঃ ডাঃ শেখ হেলাল উদ্দীন আহমদ	৩১–৩২
❑ সংবাদ	ঃ	৩৩-৩৪
❑ লন্ডন জলসার প্রোগ্রাম ❑ বেলজিয়াম জামাতের জলসার খবর	ঃ	৩৬

প্রচ্ছদ ঃ ইউ, কে, জলসা ১৯৯৮ ঃ নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) ভাষণদানরত।

ব্যক্তিগত ঘটনা

হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ) বলেন, আমি আপনাদেরকে নিজের একটি ঘটনা শুনাচ্ছি। ঐদিনগুলোর কথা যখন বাংলাদেশে খুবই বিপর্যয় চলছিলো (ঐ সময় উহাকে পূর্ব পাকিস্তান বলা হতো)। আমি করাচীতে ছিলাম। হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহেঃ) আমাকে একটি কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেন, এবং আদেশ দেন, "সত্বর চলে যাও।" আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম, সমস্ত সীট 'বুক' করা হয়ে গেছে। পি, আই, এ-তে আমাদের আহমদী অফিসার কাজ করতেন। সিটের তো কোন প্রশ্নই ছিলো না। কেননা, অপেক্ষাকারীদের তালিকায় ২০ জন যাত্রী ছিলেন। যদি সীট খালি হয় তাহলে আমরা তাদের দিয়ে দেবো। আপনার থাকার তো প্রশ্নই উঠে না।

আমি বল্লাম, আর কেউ যাক বা না যাক আমি যাবোই। কেননা, আমার আদেশ এসে গেছে। সুতরাং আমি এয়ারপোর্টে চলে গেলাম। সেখানে লাইন লেগে গিয়েছিলো। যাত্রীরা অপেক্ষা করছিলো। কিছু সময় পরে লোকদেরকে বলা হলো যে, বিমান প্রস্তুত। এর পরে সকলে চলে গেলেন কোন 'চাঞ্চের' লোক অবশিষ্ট থাকলো না। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, ইহা হতেই পারে না যে, আমি যাবো না। হঠাৎ ডেস্ক থেকে আহ্বান আসলো–একজন যাত্রীর স্থান বাকী আছে। এমন কেউ আছেন কি যার নিকটে টিকেট আছে ? আমি বল্লাম, আমার নিকট টিকেট আছে। তারা বল্লো, দ্রুত যান। বিমান একটি লোকের জন্যে অপেক্ষা করছে।

তিনি (আইঃ) বলেন, এখন দেখো, এসব কথার এতই তাৎপর্য যে, কোন ঘটনাচক্রের প্রশ্নই আসাতে পারে না। দৃঢ়-বিশ্বাসের সাথে মানুষ বলে দিতে পারে যে, আল্লাহ্তাআলার আশিস বর্ষিত হয়েছে। ইহা কোন কাকতালীয় ব্যাপার হতেই পারে না (দৈনিক আল ফযল, রাবওয়া, ২৫/৯/৯৮)।

কুরআন মজীদ

সূরা আল্ আন'আম - ৬

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ইহাতে ১৬৬ আয়াত এবং ২০ রুকূ আছে।

১। আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি) যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

২। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবী সৃষ্টি ৮৯৭ করিয়াছেন আর অন্ধকাররাশি ও আলোকের উদ্ভব করিয়াছেন; ইহা সত্ত্বেও যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা তাহাদের প্রভুর সমকক্ষ স্থিরীকৃত করে।

৩। তিনিই তোমাদিগকে কাদা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর, তিনি এক নির্দিষ্ট মিয়াদ ৮১৯ নির্ধারিত করিয়াছেন। এবং তাঁহার নিকট ৮১৯ অপর একটি নির্দিষ্ট মিয়াদ রহিয়াছে। তথাপি তোমরা সন্দেহ কর।

৪। আর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে ৮২০ তিনিই আল্লাহ্। তিনি তোমাদের গুপ্ত এবং তোমাদের প্রকাশ্য সব কিছু জানেন। এবং তিনি উহাও জানেন যাহা তোমরা অর্জন কর।

৫। এবং তাহাদের নিকট তাহাদের প্রভুর নিদর্শনাবলী হইতে যে নিদর্শনই ৮২১ আসে তাহারা উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

৮১৭। 'জা'আলা' শব্দ কোন কোন সময় 'খালাকা' শব্দের সমার্থক রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে (যাহার অর্থ তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন); কিন্তু দ্বিতীয় শব্দ যখন কোন বস্তু পরিমিতভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী সৃষ্টি করার প্রকাশ করে, তখন প্রথমোক্ত শব্দ কোন জিনিষের বিশেষ অবস্থা বা পরিবেশ, অথবা ইহা গঠিত করা বা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা বুঝায় (লেইন)। পৌত্তলিকতার বুনিয়াদ মনে হয় দুইটি মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুরা এই মতবাদের প্রধান সমর্থক। তাহাদের মতে ঈশ্বর তাঁহার ক্ষমতা অন্য কতকগুলি সত্তাতে অর্পণ করিয়াছেন। জরথুস্ত্রীয়গণ দুই খোদায় বিশ্বাস করেঃ অহূরমুজদ-আলোর খোদা এবং আহ্‌রিমন্-অন্ধকারের খোদা। আলোচ্য আয়াত উক্ত উভয় মতবাদই খন্ডন করে এবং ঘোষণা করে যে, আল্লাহ্‌তাআলা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি-কর্তা এবং তিনিই আলো এবং অন্ধকার সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যেহেতু সকল শক্তি এবং সকল প্রশংসা তাঁহারই, অতএব, তাঁহার কি প্রয়োজন যে, তিনি অন্যের উপর ক্ষমতা অর্পণ এবং কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব প্রদান করিবেন ?

৮১৮। মানুষের সৃষ্টি এবং তাহার মৃত্যু (নির্ধারিত সময়ে) আল্লাহ্‌তালার করুণার কর্ম বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে।

৮১৯। "মিয়াদ" শব্দের অর্থ ঃ (১) ব্যক্তি-জীবনের পরিসর সম্পর্কিত এবং (২) "সময়-সীমা" বিশ্ব-জগতের জীবন বা অস্তিত্বকাল নির্দেশ করে।

৮২০। আয়াতের অর্থ ইহা নহে যে, আল্লাহ্‌তাআলার সত্তা আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহার মর্মার্থ হইল, সমগ্র বিশ্বচরাচর তাঁহার জ্ঞানের আওতাভুক্ত।

৮২১। আল্লাহ্‌তাআলার জ্ঞান ও শক্তির অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হইতেছে, তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ যাহা তিনি তাঁহার নবী-রসূলগণের নিকট প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং ইহাদের মাধ্যমে প্রবল বাধা-বিপত্তির মোকাবিলাতে তাহাদের প্রতি তাঁহার অপ্রতিহত ও অসাধারণ সাহায্য এবং সমর্থন জানাইয়া থাকেন। এই সকল বিষয়কেই মু'জেযা ও নিদর্শন বলা হয়।

হাদীস শরীফ

আত্মীয়তার সম্পর্ক

কুরআন

'যাহারা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারকে, উহা সুদৃঢ় করিবার পর, ভঙ্গ করে এবং যেই সম্পর্ককে অটুট রাখিতে আল্লাহ্ আদেশ দিয়াছেন উহাকে ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করিয়া বেড়ায়, ইহারাই ক্ষতিগ্রস্থ হইবে।'

হাদীস

বুল্লু আরহামাকুম ওয়া লাও বিস সালামে

অর্থাৎ ঃ নিজ আত্মীয়তার সম্পর্ককে সজীব রেখো (সম্পর্ককে জীবিত রাখার চেষ্টায় লিপ্ত থেকো) যদি কিছু করতে না-ই পারো তবে সালাম দ্বারা (উহাকে অর্থাৎ সম্পর্ককে জীবিত) রাখো (ওয়াকী ফীয্ যাহেদে)।

ব্যাখ্যা ঃ ইসলাম এমন এক পরিপূর্ণ শিক্ষা মানব জাতিকে দিয়েছে যার উপর আমল করলে এ দুনিয়া জান্নাতের সদৃশ্য হতে পারে। সকল ধরনের হানাহানি ও সামাজিক অশান্তি বন্ধ হবে।

কুরআন মানবের মানবীয় সকল দিককে উদ্বুদ্ধ করে উহার সুফল ও কুফল বর্ণনা করেছে। কুরআন বলে, আল্লাহ্ যে সকল সম্পর্ককে দৃঢ় ও জোড়া লাগিয়ে রাখতে বলেছেন অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক-যারা উহাকে কর্তন করবে তারা হলো বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী। এবং পরিণামে এরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। খোদাতাআলা বলছেন, আত্মীয়তার এ সম্পর্ককে তোমরা অটুট রেখো। ইহা কর্তন কর না তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

আঁ হযরত (সঃ) আমাদের জানাচ্ছেন, হে আমার উম্মত ! তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ককে জিইয়ে রেখো। যদি অন্য কিছু দ্বারা সম্ভব না-ও হয় তবে নূন্যতম সালাম দ্বারা অর্থাৎ দেখা সাক্ষাৎ দ্বারা উহাকে ধরে রেখো।

ইহার আরেক অর্থ হলো তোমার আত্মীয় তোমার সাথে যতই দুর্ব্যবহার করুক না কেন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে উহাকে (আত্মীয়তা) সালাম অর্থাৎ দোয়ার মাধ্যমে ধরে রেখো। সে অকল্যাণ চাইলেও তুমি যেন তার কল্যাণকামী হও।

কতই না মহান শিক্ষা যে, খোদার সন্তুষ্টি যাতে রয়েছে উহাকে যেন কোন মূল্যেই আমরা বিসর্জন না দিই। আল্লাহ্ করুন আমরা সবাই যেন ইসলামের এই মহান শিক্ষার উপর আমল করে যাই, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ **মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী**

অমৃত বাণী

অহংকার

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

"আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, অহংকার হইতে বাঁচ। কেননা, অহংকার আমাদের মহা প্রতাপান্বিত খোদার দৃষ্টিতে ঘৃণ্য। কিন্তু তোমরা সম্ভবতঃ বুঝিবে না যে, অহংকার কী জিনিস। অতএব আমার নিকট হইতে বুঝিয়া নাও। কেননা, আমি খোদা কর্তৃক প্রদত্ত জ্ঞানের আলোকে বলিতেছি।

প্রত্যেক ব্যক্তি, যে নিজ ভাইকে এই জন্য হেয় জ্ঞান করে যে, সে তাহার চাইতে অধিক জ্ঞানী বা অধিক বুদ্ধিমান বা অধিক কৌশলী, সে অহংকারী। কেননা, সে খোদাকে বুদ্ধি ও জ্ঞানের উৎস মনে করে না এবং নিজেকে কিছু একটা সাব্যস্ত করে। খোদা তাহাকে পাগল করিয়া দিতে এবং তাহার ঐ ভাইকে, যাহাকে সে হেয় মনে করে, তাহার তুলনায় তাহাকে উত্তম জ্ঞান, বুদ্ধি ও কৌশল দান করিতে কি শক্তিমান নহেন ? তদ্রূপেই ঐ ব্যক্তি, যে নিজের কোন ধন-ঐশ্বর্য-এর কথা মনে করিয়া তাহার ভাইকে হেয় জ্ঞান করে, সে-ও অহংকারী। কেননা, সে এই কথা ভুলিয়া গিয়াছে যে, এই ধন-ঐশ্বর্য খোদাই তাহাকে দিয়াছিলেন। সে অন্ধ এবং সে জানে না যে, ঐ খোদা সর্বশক্তিমান। তিনি তাহার উপর এইরূপ একটি বিপদ অবতীর্ণ করিতে পারেন যাহা এক মুহূর্তে তাহাকে আসফালা সাফেলীন (অর্থ ঃ হেয় হইতে হেয়তর স্তরে) পর্যায়ে লইয়া যাইতে পারে এবং তাহার ঐ ভাইকে, যাহাকে সে হেয় জ্ঞান করে, তাহার চাইতে অধিক উত্তম ধন-সম্পদ দান করিতে পারেন। তদ্রূপেই ঐ ব্যক্তি, যে নিজের দৈহিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে গর্ব করে, বা নিজের সৌন্দর্য ও রূপ এবং শক্তি ও সামর্থ্যের ব্যাপারে দাম্ভিক হয় এবং নিজের ভাইকে হাসি-বিদ্রূপের সহিত ছোট করে এবং তাহার দৈহিক ত্রুটির কথা লোকদেরকে শুনায়, সে-ও অহংকারী। সে এই খোদা সম্পর্কে অনবহিত যে, তিনি এক মুহূর্তে তাহার উপর এইরূপ দৈহিক ত্রুটি আনিতে পারেন যদ্দরুন সে ঐ ভাই-এর চাইতেও কুৎসিৎ হইতে পারে। দীর্ঘকাল যাবৎ যাহাকে হেয় জ্ঞান করা হইয়াছে খোদা তাহার শক্তিতে এইরূপ বরকত দিতে পারেন যে, সে না ছোট থাকিবে এবং না পরিত্যক্ত হইবে। কেননা, তিনি যাহা চাহেন তাহা করেন। এইরূপেই ঐ ব্যক্তি, যে তাহার শক্তির উপর ভরসা করিয়া দোয়ায় অলস হয়, সে-ও অহংকারী। কেননা, সে শক্তি ও কুদরতের উৎসকে সনাক্ত করে নাই এবং নিজেকে কিছু একটা মনে করিয়াছে। অতএব তোমরা, হে আমরা বন্ধুরা ! এই সকল কথা স্মরণ রাখ। এমন যেন না হয় যে, তোমরা কোন দিক হইতে খোদাতাআলার দৃষ্টিতে অহংকারী সাব্যস্ত হইয়া যাও এবং তোমরা তাহা সম্পর্কে অনবহিত থাক। এক ব্যক্তি, যে তাহার এক ভাইকে ভুল কথা দ্বারা অহংকারের সহিত সংশোধন করে, সে-ও অহংকারে অংশ নিয়াছে। এক ব্যক্তি, যে তাহার ভাই-এর কথা বিনয়ের সহিত শুনিতে চায় না এবং মুখ ফিরাইয়া নেয়, সে-ও অহংকারে অংশ নিয়াছে। এক গরীব ভাই, যে তাহার পাশে বসিয়াছে এবং সে তাহাকে ঘৃণা করে, সে-ও অহংকারে অংশ নিয়াছে। এক ব্যক্তি, যে দোয়াকারীকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের সহিত দেখে, সে-ও অহংকারে একটি অংশ নিয়াছে। ঐ ব্যক্তি, যে পরিপূর্ণভাবে খোদার প্রত্যাদিষ্ট ও প্রেরিত পুরুষের আনুগত্য করিতে চাহে না, সে-ও অহংকারে একটি অংশ নিয়াছে। ঐ ব্যক্তি, যে খোদার প্রত্যাদিষ্ট ও প্রেরিত পুরুষের কথা মনোনিবেশের সহিত শুনে না এবং তাঁহার লেখা মনোযোগের সহিত পড়ে না, সে-ও অহংকারে একটি অংশ নিয়াছে। অতএব চেষ্টা কর যেন অহংকারের কোন অংশ তোমাদের মধ্যে না থাকে যাহাতে তোমরা ধ্বংস না হও এবং পরিবার-পরিজনসহ মুক্তি পাও। খোদার প্রতি ঝোঁক। পৃথিবীতে যতখানি কাহাকেও ভালবাসা সম্ভব তাহাকে ততখানি ভালবাস। পৃথিবীতে যতখানি মানুষ কাহাকেও ভয় পাইতে পারে তোমরা ততখানি ভয় তোমাদের খোদাকে কর। পবিত্র হৃদয়ের মানুষ হইয়া যাও। পবিত্র ইচ্ছার মানুষ হইয়া যাও। গরীব মিসকীন ও অনিষ্টকারিতাহীন হইয়া যাও যাহাতে তোমাদের উপর দয়া করা হয়" (নযূলুল মসীহ্, পৃঃ ২৬, ২৭)।

"অতএব তোমরা সোজা-সরল হইয়া যাও; পরিচ্ছন্ন হইয়া যাও; পবিত্র হইয়া যাও; এবং খাঁটি হইয়া যাও। যদি এক বিন্দু অন্ধকার তোমাদের মধ্যে বাকী থাকে তবে উহা তোমাদের সকল জ্যোতিঃ বিনষ্ট করিয়া দিবে। যদি কোন দিক হইতে তোমাদের মধ্যে অহংকার বা 'রিয়া' বা আত্মশ্লাঘা বা আলস্য থাকে তবে তোমরা গ্রহণযোগ্য হইবে না। এমন যেন না হয় যে, তোমরা কয়েকটি কথা শিখিয়া লইয়া নিজদিগকে ধোঁকা দাও যে, আমাদের যাহা কিছু করার ছিল করিয়া ফেলিয়াছি। কেননা, খোদা চাহেন যে, তোমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ পরিবর্তন আসুক। খোদা তোমাদের নিকট হইতে এক মৃত্যু চাহেন। ইহার পর তিনি তোমাদিগকে জীবিত করিবেন" (কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃঃ ২৫)।

"হে মাটির কীট! অহংকার ও দম্ভ বিসর্জন দাও। অহংকার শোভা পায় আত্মাভিমানী সম্মানিত খোদার। নিজের ধারণায় সকলের নিকট নিকৃষ্ট হইয়া যাও। সম্ভবতঃ ইহাতেই মিলনস্থলের প্রবেশ পত্র পাইবে। দম্ভ ও অহংকার বিসর্জন দাও। ইহার মধ্যেই নিহিত আছে তাকওয়া। মাটি হইয়া যাও। ইহার মধ্যেই নিহিত আছে প্রভুর সন্তুষ্টি। খোদার জন্য বিনয় অবলম্বন করার মধ্যে রহিয়াছে তাকওয়ার শিকড়। অশ্লীলতা হইতে বাঁচিয়া থাক, যাহা ধর্মের শর্ত, ইহার সবটাই নিহিত আছে তাকওয়ার মধ্যে" (বারাহীনে আহমদীয়া, পঞ্চম খন্ড, পৃঃ ৯০৮)।

"অহংকার কয়েক প্রকারের হইয়া থাকে। কখনো ইহা চক্ষু হইতে বাহির হয় যখন অন্যকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হয়। ইহার এই অর্থই হয় যে, অন্যকে হেয় ও নিজেকে বড় জ্ঞান করা হয়। কখনো ইহা মুখ হইতে বাহির হয়। কখনো ইহার প্রকাশ মাথা দ্বারা করা হয়। কখনো হাত ও পা দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হয়। মোট কথা, অহংকারের কয়েকটি উৎস আছে। এই সকল উৎস হইতে মু'মিনের বাঁচিয়া থাকা উচিত। ইহার কোন অংশ এমন যেন না হয়, যাহা হইতে অহংকারের গন্ধ আসে এবং উহা অহংকার প্রকাশকারী।

সুফীগণ বলেন, মানুষের মধ্যে মন্দ চরিত্রের অনেক জিন্ন আছে। যখন এইগুলি বাহির হইতে থাকে তখন বাহির হইতেই থাকে। কিন্তু সবগুলির চাইতে শেষের জিন্ন হইয়া থাকে অহংকার, যাহা তাহার মধ্যে থাকে। উহা খোদাতাআলা ফযল ও মানুষের খাঁটি প্রচেষ্টা ও দোয়া দ্বারা দূর হয়।

অনেক লোক নিজেদেরকে বিনয়ী মনে করে। কিন্তু তাহাদের মধ্যেও কোন না কোন প্রকারের অহংকার থাকে। এই জন্য অহংকারের সূক্ষ্ম

হইতে সূক্ষ্মতর প্রকারসমূহ হইতে বাঁচিয়া চলা উচিত। কোন কোন সময়ে এই অহংকার ধন-সম্পদ হইতে সৃষ্টি হয়। ধনী অহংকারী অন্যদেরকে কাঙাল মনে করে এবং বলে, এই ব্যক্তি কে, যে আমার মোকাবেলা করে ? কোন কোন সময় বংশের ও জাতের অহংকার হইয়া থাকে। সে মনে করে আমার জাত বড় এবং এই ব্যক্তি ছোট জাতের। . . . কোন কোন সময় জ্ঞানের দরুনও অহংকার সৃষ্টি হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি ভুল বলিলে সে তাড়াতাড়ি তাহার দোষ ধরে এবং হৈ চৈ করে যে, এ তো একটি শব্দও সঠিক বলিতে পারে না। মোট কথা, অহংকার বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে এবং ইহাদের সব কয়টি মানুষকে পুণ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া দেয় এবং মানুষের উপকার করা হইতে বাধা দিতে থাকে। এই সব হইতে রক্ষা পাওয়া উচিত। কিন্তু এই সব হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এক মৃত্যুর প্রয়োজন। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এই মৃত্যুকে গ্রহণ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার উপর খোদাতাআলার বরকত অবতীর্ণ হইতে পারে না এবং খোদাতাআলা তাহার অভিভাবক হইতে পারেন না" (মলফুযাত, ষষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৪০১-৪০৩)।

"অহংকার ও দুষ্টামী খারাপ জিনিষ। একটি সামান্য কথা দ্বারা সত্তর বৎসরের আমল (পুণ্যকর্ম) বিনষ্ট হইয়া যায়। লেখা আছে যে, এক ব্যক্তি 'আবেদ' (খোদার উপাসনাকারী) ছিল। সে পাহাড়ের উপর থাকিত। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সেখানে বৃষ্টি হয় নাই। এক দিন বৃষ্টি হইল। ঐ বৃষ্টি পাথর ও কাঁকরের উপরও হইল। তখন তাহার হৃদয়ে এই আপত্তির উদ্ভব হইল যে, বৃষ্টির প্রয়োজন তো ছিল ক্ষেত ও বাগানের জন্য। ইহা কেমন ব্যাপার যে, পাথরের উপর বৃষ্টি হইল ? এই বৃষ্টিই যদি ক্ষেত-খামারে হইত তবে কতই না উত্তম হইত ! ইহাতে খোদাতাআলা তাহার সমস্ত বেলায়েত ছিনাইয়া নিলেন। অবশেষে সে খুবই ব্যথাতুর হইল। . . . . এখন দেখ, মানুষ কত আপত্তি উত্থাপন করে। যদি একটু বেশী বৃষ্টি হয় তখন বলে, আমাদেরকে ডুবাইতে আরম্ভ করিয়াছে। যদি বৃষ্টিপাতে কিছুটা বিরতি হয় তখন বলে, এখন আমাদিগকে মারিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সকল আপত্তি কতইনা মন্দ ! দেখ, তাকওয়া কত কম হইয়া গিয়াছে। যদি দুই এক আনা রাস্তায় পাওয়া যায় তৎক্ষণাৎ তাহা উঠাইয়া নেয় এবং এ সম্পর্কে কাহাকেও বলে না। অথচ ব্যাপারটি সকলকে শুনাইয়া দেওয়া ও যাহার ছিল তাহাকে দিয়া দেওয়াই ছিল তাকওয়ার কাজ। এরপরও বলে বৃষ্টি হয় না। বৃষ্টি কীভাবে হইবে ? আল্লাহ্‌তাআলা অনেক পাপ ক্ষমাই করিয়া দেন। যদি বেশী বৃষ্টি হয় তবে দোহাই দেওয়া হয়। যদি রৌদ্র বেশী হয় তখনও দোহাই দেওয়া হয়। এই সকল অবস্থায় মানুষ তাকওয়াশূন্য হইয়া পড়ে। অতএব ধৈর্য ধারণ করা উচিত। যদি ধৈর্য ধারণ না করা হয় তবে কাফের হইয়া রুটি খাওয়া তো হারাম। মানুষের কখনো খোদাতাআলার উপর আপত্তি উত্থাপন করা উচিত নয়" (মলফুযাত, খন্ড ৬, পৃঃ ৫৭, ৮ নভেম্বর মুদ্রণ, ১৯২৩ইং)।

অনুবাদ – নাজির আহমদ ভুঁইয়া

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মাযযিকহুম কুল্লা মুমাযযাকিন ওয়া সাহ্‌হিকহুম তাস্‌হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্‌ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল। মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁ

রোড # ৪৫-৪৬ # ৩২এ গুলশান, ঢাকা-১২১২

ফোনঃ ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৫০

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

সালমান

অস্থায়ী অফিস ঃ

৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা

ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

তৌযীহে মরাম

(লক্ষ্য-বস্তুর বিশ্লেষণ)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

(১৩তম কিস্তি)

এখন যখন এই কানুনে এলাহী বা ঐশী বিধান আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, ওয়াজিবুল ওজুদ খোদাতাআলার ইরাদা বা ইচ্ছা পূরণ করিতে এই পৃথিবীর যাহা কিছু আছে সবাই অংগ-প্রত্যঙ্গ হিসেবে কাজ করে, প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়গায় (হাত পায়ের মত) তাহার ইচ্ছা পূরণ করিতে সাহায্য করে। এই সমস্ত অংগ-প্রত্যঙ্গই তাঁহার ইচ্ছাকে বাস্তবরূপ দান করে। তাঁহার কোন ইচ্ছা এই সমস্ত বস্তুর মাধ্যম ব্যতিরেকে বাস্তবায়িত হয় না। এখানে জানা আবশ্যক যে, খোদাতাআলার ওহী যাহা পাক-সাফ দিলগুলিতে নাযেল হয় তাঁহার মাধ্যম হিসেবে ফিরিশ্‌তা জিব্‌রাঈলের অবস্থানকে এক জরুরী মসলা হিসেবে ইসলামী শরীয়তে যে স্বীকার করা হইয়াছে ইহারও কারণ ঐ একই দর্শন (মাধ্যমের দর্শন) যাহা উপরে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বিশদ বিবরণ এই যে, ওহীর এলকা (অবতরণ) অথবা ওহীর মালকা (ওহী লাভ করার ক্ষমতা) দান করার জন্য একটি মাধ্যম অঙ্গের মত কাজ করে সেই মাধ্যমকে জিব্‌রাঈল নামে আখ্য দেওয়া হইয়াছে- যে যখনই আল্লাহ্ ওহী নাযেলের ইচ্ছা করেন তখন স্বভাবজাতভাবেই আন্দোলিত হয় বা কার্যসাধনে ব্রতী হয় বা হরকতে আসে-- যে কোন দেরী না করিয়া সাথে সাথেই অংগ-প্রত্যঙ্গের মত হরকতে আসে এবং ইহাই সত্য সত্য ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ যখন খোদাতাআলা প্রেমিক অন্তরের দিকে প্রেম নিয়া অগ্রসর হন (মহব্বত করনেওয়ালা দিলের দিকে মহব্বতের সাথে রুজু করেন) তখন জিব্‌রাঈলকে হরকত করিতে হয় সেইভাবে যেইভাবে শ্বাসের হাওয়া অথবা চক্ষুর জ্যোতিঃ গতিশীল হয়, খোদার সাথে তাহার এই প্রকারই সম্পর্ক। অথবা যদি এইভাবে বল যে, খোদাতাআলার গতিশীল হওয়ার সাথে সাথে সে-ও বেলা এখতিয়ার বা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বেলা ইরাদা বা ইচ্ছার বাহিরে গতিশীল হইতে বাধ্য হয়। যেমনভাবে আসল বস্তুর সঞ্চালিত হওয়ার সাথে সাথে স্বভাবতঃ ছায়াও সঞ্চালিত হইতে বাধ্য। সুতরাং যখন জিব্‌রাঈলী নূর খোদাতাআলার আকর্ষণে, তাহরীক দ্বারা এবং নূখফায়ে নূরানীয়া (আলোকে ফুৎকার করা) দ্বারা সঞ্চালিত হয় তখনই সত্যিকার খোদা-প্রেমিকের হৃদয়ে একটি ছবি অংকিত হয় যাহাকে রূহুল কুদুস বা পবিত্র আত্মা নামে আখ্যায়িত করা যাইতে পারে এবং প্রেমিকের সত্যিকার প্রেমের এক গভীর রেখাপাত হয় তাহার হৃদয়ে প্রেমাস্পদের প্রেমের দ্বারা ; তখন সেই শক্তি খোদাতাআলার আওয়াজ শ্রবণ করার জন্য কর্ণের কার্য সম্পাদিত করে ; এবং তাঁহার আশ্চর্য জিনিসগুলি দেখার জন্য চক্ষু কার্য করে, এবং তাহারই ইলহামাত জিহ্‌বার উপরে জারী করার জন্য জিহ্‌বার মধ্যে এক গতিশীলতা আসে যাহা জোরের সাথে ইল্‌হামের সাথে সাথে গতিশীল হয়; যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের দিলে এই ক্ষমতা না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ঐ রেলগাড়ীর মত পড়িয়া থাকে যাহাকে গতি সঞ্চার করার জন্য উহার সাথে ইঞ্জিনযুক্ত হয় নাই। মানুষের দিল তখন পর্যন্ত অন্ধ থাকে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, এই যে শক্তি যাহাকে রূহুল কুদুস নামে আখ্যায়িত করা হইয়া থাকে ইহা সবার মধ্যে সমানভাবে আসে না। বরং মানুষের মধ্যে খোদার প্রেম যেমন কামেল (পরিপূর্ণ) অথবা নাকেস (অপরিপক্ক) হইয়া থাকে তেমনি জিব্‌রাঈলী নূর ও কামেল বা নাকেসভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, এই রূহুল কুদুস যাহা এই দুইটি মহব্বত একত্রিত হওয়ার পরে ইনসানের (মানুষের) দিলে (অন্তরে) জন্ম লাভ করে জিব্‌রাঈলী নূরের অবতরণের ফলে তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ লাভের জন্য ইহা জরুরী নহে যে, সবসময় মানুষ খোদাতাআলার পাক কালাম শুনিতেই থাকিবে। বরং ইহা তো আসমানী নূরসমূহ লাভ করার জন্য নৈকট্যের উপকরণসমূহ মাত্র। অথবা এইভাবে বলিতে পার যে, ইহা এক রূহানী রোশনী (আধ্যাত্মিক আলো) যাহা রূহানী চক্ষুকে দেখিতে সাহায্য করে অথবা ইহা এক রূহানী হাওয়া যাহা রূহানী কানকে শুনিতে সাহায্য করে যাহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে আসে। এবং ইহা পরিষ্কার যে, যখন পর্যন্ত কোন জিনিস সামনে হাজির না থাকে শুধু আলো কোন কিছু দেখাইতে পারে না। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না মোতাকাল্লেম বা কথক কথা না বলে শুধু হাওয়া কোন আওয়াজ শুনাইতে পারে না। সুতরাং এই রৌশনী বা আলো এবং এই হাওয়া রূহানী শক্তিগুলিকে সাহায্য করার জন্য আল্লাহ্ হইতে মানুষ লাভ করে যেভাবে জাহেরী কানের জন্যে বাতাসকে মাধ্যম হিসেবে নির্ধারিত করা হইয়াছে। এবং যখন বা'রীতাআলার ইচ্ছা এই দিকে মনযোগী হয় যে, স্বীয় বাক্যে তাঁহার কোন মুলহেমের (ইলহাম লাভকারী মানুষ) অন্তরে পৌঁছাতে চাহেন তখন আল্লাহ্ তাহার কথক হিসেবে কথা বলার শক্তিতে একটি ঢেউ উঠে যাহাকে জিব্‌রাঈলী নূরের ঢেউ বলা যাইতে পারে যাহা সেই আওয়াজকে মুলহেমের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয় ; অথবা বাতাসে একটি ঢেউ পয়দা হয় যাহা মুলহেমের কর্ণ পর্যন্ত সেই আওয়াজকে পৌঁছাইয়া দেয়, অথবা জিহ্‌বার মধ্যে একটি তাহরীক পয়দা হয় জিব্‌রাঈলী ঢেউ দ্বারা যাহা জিহ্‌বাকে সঞ্চালিত করে, এইভাবে সেই রূহানী জগতে একটি জিব্‌রাঈলী নূরের ঢেউ পয়দা হয় যাহা দ্বারা আল্লাহ্‌র কথা মুলহেমের হৃদয়ে অংকিত হয়, অথবা কর্ণে পতিত হয় অথবা তাহার জবানে জারী হয়। সেই যে জিব্‌রাঈলী নূরের উত্তাপ বা ঢেউ উহা যখন প্রবাহিত হয় তখন মুলহেমের চোখের সামনে আল্লাহ্‌র কথাগুলি কোন কিছুতে লিখিতভাবে ভাসিয়া উঠে, অথবা তাহার কান পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছিয়া যায় অথবা তাহার জিহ্‌বাতে ইলহামী কথাগুলি জারী হয়। এবং রূহানী অনুভূতি-শক্তি এবং রূহানী রৌশনী ইলহাম হইবার আগে তাহাকে দেওয়া হইয়া থাকে এক শক্তি হিসেবে যেন সে ইলহাম লাভ করিতে পারে, তাহার মধ্যে যেন গ্রহণ করার একটি ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। এই দুইটি শক্তি এইজন্য দেওয়া হয় যেন ইলহাম নাযেল হইবার আগে মুলহেমের মধ্যে ইলহামকে ধারণ করার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। কেননা, যদি এমন অবস্থায় ইলহাম নাযেল করা হয় যে, মুলহেমের দিল এখনও রূহানী অনুভূতি হইতে বঞ্চিত অথবা রূহুল কুদুসের আলো এখনও তাহার অন্তর্চক্ষুকে আলোকিত করে নাই তাহা হইলে সে ইলহামে এলাহীকে কোন্ চক্ষুর পবিত্র আলো দ্বারা দেখিতে পাইবে ! সুতরাং এই প্রয়োজনেই এই দুইটিই মুলহেমকে পূর্বেই দেওয়া হইয়া থাকে। এবং এই তাহকীক (অনুসন্ধান) হইতে পাঠকবৃন্দ এই কথাও বুঝিতে পারিবেন যে, ওহীর ব্যাপারে জিব্‌রাঈলের তিনটি কাজ করিতে হয়।

প্রথমতঃ যখন আল্লাহ্ কোন ব্যক্তিকে ইলহাম লাভের ক্ষমতা দিতে চান তখন তাহার ফিৎরতের মধ্যে তাহা পয়দা করেন যাহার মধ্যে মানুষের আমলের কোন দখল থাকে না সৃষ্টির প্রথম লগ্নেই আল্লাহ্‌তাআলা তাহার মধ্যে ইলহাম লাভের ক্ষমতা সৃষ্টি করিতে ইরাদা করেন তখন জিব্‌রাঈল তাহার শুক্রকীট যখন তাহার মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে তখনই তাহার উপর তাহার নূরের ছায়া অবতীর্ণ করে, ফলে সে ইলহাম লাভ করার বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয় তাহার মধ্যে ইলহাম ধারণ করার ক্ষমতা বা খাওয়াস সে পাইয়া যায়। অতঃপর জিব্‌রাঈলের দ্বিতীয় কাজ ইহাতে যে, যখন বান্দার মহব্বত খোদাতাআলার মহব্বতের ছায়ার নীচে আসিয়া যায় তখন আল্লাহ্‌তাআলার মুরুব্বীয়ানা হরকতের কারণে অর্থাৎ অভিভাবক হিসেবে আল্লাহ্ নিজেই যখন তাহার তালীম-তরবীয়ত করেন তখন আল্লাহ্‌র বিশেষ মনযোগের কারণে জিব্‌রাঈলের দায়িত্বে দায়িত্ববান হইয়া নূতনভাবে হরকত করে বা নূতন কর্মচাঞ্চল্য দেখায় এবং খোদার সত্যিকারের প্রেমিকের হৃদয়ের উপরে এক নূর অবতীর্ণ করেন অর্থাৎ মুহিব্বে সাদেকের দিলের উপরে এক আকসী তসবীর জিব্‌রাঈলের অংকিত হইয়া যায়। যাহা এক রৌশনী বা আলো, হাওয়া বা বাতাস বা গরমী বা উষ্ণতা হিসেবে কাজ করে এবং মুলহেমের ভিতরে ইলহাম লাভের প্রতিভা হিসেবে লুক্কায়িত থাকে। মুলহেমের দিলের একটি অংশ জিবরাঈলী নূরের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে এবং দ্বিতীয় জিব্‌রাঈল মুলহেমের দিলের ভিতরে প্রবেশ করে যাহাকে অন্যকথায় বলা যাইতে পারে রূহুল কুদুস বা তাহার তসবীর বা প্রতিবিম্ব (চলবে)।

অনুবাদ- ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া

জুমুআর খুতবা

আয়াতুল কুর্সির মাহাত্ম্য ও গভীর তাৎপর্য

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯ইং মসজিদ ফযল, লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর সূরা বাকারাহ্‌র ২৫৬তম আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ۝

অতঃপর বলেন, "আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া" – এখানে সর্বাগ্রে 'আল্লাহ্' শব্দটি রাখা হয়েছে তারপর রয়েছে এরই ব্যাখ্যা। এ শব্দটি মহান সৃষ্টিকর্তার মৌলিক নাম। এরপরে গোটা এই আয়াতুল-কুর্সি 'আল্লাহ্' শব্দেরই বিভিন্ন গুণের ওপরে আলোকপাত করে। 'কেবলমাত্র আল্লাহ্' এই একটি তরজমা এর হতে পারে অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্‌ই আছেন। আরেকটি তরজমাও, যা আমাদের ওখানকার খোদাভক্ত দরবেশদের মুখে সবসময় উচ্চারিত হয়ে আসছে 'আল্লাহ্-ই আল্লাহ্, আল্লাহ্-ই আল্লাহ্'। বাস্তব ঘটনা এই যে, মানুষ যখন দোয়া করতেও অক্ষম হয়ে পড়ে এবং তার পক্ষে কোন কিছু করার সাধ্য বা উপায় না থাকে তখন তার মুখ দিয়ে 'আল্লাহ্' শব্দটিই বের হয়। আর ওটাই তার জন্যে দোয়া (স্বরূপ) হয়ে যায়। আমার মতে সবচে' পরিপূর্ণ দোয়া হচ্ছে 'আল্লাহ্' শব্দটি। অসুস্থ ব্যক্তিও 'আল্লাহ্,' কেবল আল্লাহ্ বলতে থাকে। অতএব আয়াতুল কুর্সিতে যেসকল বিষয়-বস্তু বর্ণিত হয়েছে তা সবই 'আল্লাহ্' শব্দের অধীনে (এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণস্বরূপ)। আল্লাহ্‌র মৌলিক গুণগত নামও আল্লাহ্-ই। এর ওপরে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) অত্যন্ত বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। কিন্তু, সময় ও সুযোগমত প্রয়োজনবোধে আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উদ্ধৃতিসমূহও আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো। প্রথমে তো তরজমা সম্পূর্ণ করতে চাই। "আল্ হাইয়্যুল কাইয়্যুম"- জীবিত ও স্বাধীষ্ঠ (নিজস্ব সত্তায় অধিষ্ঠিত)। এরূপ জীবিত নন যাঁকে অন্য কেউ জীবিত রেখেছে। 'আল্ কাইয়্যুম'-এর সঙ্গে 'আল্ হাইয়্যু' শব্দ বেঁধে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ নিজে জীবিত এবং নিজ সত্তায় কায়েম। অন্য কথায়, তিনি চীরঞ্জীব, জীবনদাতা চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতা)। "লা তা'খুযুহূ সিনাতুও ওয়ালা নাওম"–এটা তার এক স্বাভাবিক চাহিদা, 'আল হাইয়্যুল কাইয়্যুমে'র পর অবলীলায় 'লা তা'খুযুহূ সিনাতুও ওয়ালা নাওম' কথাটি আসাই উচিত ছিল –'না তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে এবং না নিদ্রা।' যিনি (মৌলিকভাবে) নিজ সত্তায় কায়েম তাঁকে ঘুম স্পর্শই করতে পারে না। (তবে) ঘুম না আসা তো মানুষের পক্ষে একটা রোগ, উত্তম কোন গুণ বা অবস্থা নয়। ঘুম আসাতে প্রমাণ হয় যে, কেউ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং তার ক্লান্তি দূর করার জন্যে খানিকক্ষণ তার ঘুমোন উচিত। আর তন্দ্রাও ঘুমেরই পূর্বাভাস। সেজন্য 'সেনাহ্' (তন্দ্রা) শব্দটিকে প্রথমে রাখা হয়েছে–'না তাঁকে তন্দ্রা স্পর্শ করতে পারে এবং না নিদ্রা'। মানুষ যেমন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লে এবং অধিকতর মনোযোগ সহকারে কাজ করতে না পারলে তন্দ্রাচ্ছন্ন হতে থাকে, কাজ করতে গিয়ে ঝিমুতে থাকে। তাছাড়া, আবার বিরক্তিবোধের দরুনও ঝিমায়। কোন সময় মানুষ ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত না থাকা সত্ত্বেও যদি এরূপ আলোচনা-বৈঠকে বসা থাকে, যেখানে বসাতে তা তার জন্য বিরক্তিবোধের উদ্রেক করে- যেমন, দীনদার (ধর্মভীরু) ব্যক্তিদের মজলিসে ঐসব লোক যারা বেদীন বা ধর্মবিমুখ হয়ে থাকে তারা সেখানে কথা-বার্তা বুঝতে সক্ষম হলেও বসে ঝিমুতে থাকে। এর অর্থ হচ্ছে ঐসব কথায় তার কোনও আগ্রহ নেই। আগ্রহ ও ঔৎসুক্য মানুষকে সচেতন ও সঞ্জীবিত রাখে এবং আগ্রহ-ঔৎসুক্য তন্দ্রার প্রতিরোধক ও চিকিৎসাও বটে। অতএব, আয়াতটিতে বাক্যগুলোর পরম্পরাগত পারস্পরিক সম্পর্ক এইরূপ দাঁড়াবে যে, তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি জিনিসে তাঁর তো (গভীর) আগ্রহ রয়েছে; যদি তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হন তাহলে বিশ্ব-জগৎ বিধ্বস্ত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। নিখিল বিশ্বের ঠেস বা নির্ভরস্বরূপ যিনি, তিনি এক মুহূর্তের জন্যও তার দিকে উদাসীন ও অমনোযোগী হতে পারেন না। যদি এক মুহূর্তও অমনোযোগিতা দেখান তাহলে এই মহাবিশ্ব টিকে থাকবে না। আর এই অমনোযোগী না হবার ব্যাপারটি হচ্ছে তাঁর পক্ষে স্বতঃপ্রবৃত্তিমূলক একটি স্বাভাবিক কাজ। এর জন্য বাড়তি কোন মনোযোগের প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ এমন নয় যে, খোদা জোর লাগাচ্ছেন যাতে অবহেলা হয়ে না যায়। বরং যেহেতু তাঁরই জিনিস, সেহেতু নিজের জিনিসের সার্বক্ষণিক হিফাযতের জন্য (যেমন) মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে থাকে, এবং যে জন্য তাকে পরিশ্রম ও কষ্ট করতে হয় না সেহেতু সে কেন-ই বা সদা মনোযোগী হবে না ? অতএব "লা তা'খুযুহূ সেনাতুন"- এক মুহূর্তের জন্যও তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। কেননা, সর্বক্ষণই তিনি তাঁর মখলুকাত-সমগ্র সৃষ্টির ব্যাপারে আগ্রহ রাখেন এবং জানেন যে, তাঁর অনাগ্রহ বা মনোযোগের অভাব সমগ্র বিশ্ব-জগতের জন্য মৃত্যুস্বরূপ। আর যেহেতু তিনি সৃষ্টির এক বিবর্তনমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন, যা আদি থেকে অনন্তকাল ব্যাপী সদা-চলমান, কাজেই তাঁর সার্বিক সৃষ্টি বলতে কেবল আমরাই নই যারা এই পৃথিবীতে আছি। বরং আবহমান কাল থেকে কতো অসংখ্য জগতের ও মহা-বিশ্বের মালিক হিসাবে তিনি বিরাজ করছেন কতো অগুণতি সৃষ্টিকে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় জীবন দান করে আসছেন ! যদি খোদাতাআলার সত্তার মাঝে বিদ্যমান থাকে আনন্ত্য ও নিত্যতা, তাহলে

এই সূত্রে তাঁর সৃষ্টির মাঝেও আনন্ত্য ও নিত্যতা নিহিত হবে। অতএব, খোদা কখনও ক্লান্ত হতেই পারেন না। এ বিষয়ে সকল বৈজ্ঞানিকের ঐক্যমত রয়েছে। কোনও জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বিমত করতেই পারে না যে, মানবীয় জীবনে সর্বক্ষণ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, আর এসব পরিবর্তনই প্রকৃতপক্ষে মানুষকে বৃদ্ধে পরিণত করতে থাকে। তাকে ক্লান্ত করে দেয়। অবশেষে মৃত্যুর দিকে সে পা বাড়ায়। অর্থাৎ মৃত্যু অভিমুখে তার সর্বশেষ যাত্রা হয়ে থাকে। সুতরাং আল্লাহ্‌তাআলার সত্তা সম্পর্কে পূর্বেও এক খুতবায় সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলাম যে, তাঁর সত্তায় কোনও পরিবর্তনের অবকাশ নেই-এ বিষয়টি আপনাদের ভালভাবে বুঝে নেওয়া উচিত। তাঁর সত্তার ক্ষেত্রে যেখানেই পরিবর্তনের ধারণা পোষণ করবেন, তৎক্ষণাৎ খোদাতাআলার অস্তিত্বে কুঠারাঘাত করে বসবেন, অর্থাৎ আপনারা তো কুঠারাঘাত করতে সক্ষম নন কিন্তু আপনাদের কল্পনাপ্রসূত খোদার অস্তিত্বই আর থাকবে না। অর্থাৎ যেখানে তাঁর সত্তায় পরিবর্তনের প্রশ্ন আসে সেখানে তাঁর অস্তিত্ব আর থাকে না। (কেননা) এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তিনি ক্লান্তও হয়ে পড়েন। পরিবর্তন ক্লান্তিকে চায় এবং পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে অবধারিতভাবে তাঁর হয়ত গভীর নিদ্রা হওয়া উচিত, নয়ত মৃত্যু ঘটে যাওয়া উচিত।

অতএব, খোদার সত্তা সব রকম পরিবর্তনের উর্ধ্বে। তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র তিনি। এ সেই প্রশ্ন যা দুনিয়ার খুব বড়ো বড়ো দার্শনিক উথাপন করেছেন এবং এর নিষ্পত্তির প্রচেষ্টায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আগেও আমি একবার বর্ণনা করেছিলাম যে, এ প্রসঙ্গে দর্শনের জগতে সবচে' উত্তম ও শ্রেষ্ঠ যে কথাটি বলা হয়েছে তা এই যে, খোদা হচ্ছেন আদি ও প্রথম কারণ (-বিশেষ) এবং 'প্রথম বা আদি কারণ' হবার দরুন তাঁর মাঝে পরিবর্তন সংঘটিত হতে পারে না। কেননা, 'ও লা নাওম' (-স্পর্শ করে না নিদ্রা) যা তন্দ্রার পরবর্তী রূপ (বা অবস্থা)। 'নাওম' সম্পর্কে স্মরণ থাকা উচিত যে, একে আরবী পরিভাষায় বলা হয় 'আন্‌নাওমু উখ্‌তুল মাওতে'- নিদ্রা হচ্ছে মৃত্যুর ভগ্নী। মৃত্যু হচ্ছে (আসলে) বিশ্রামস্থল। মানুষ তার জীবন পরিক্রম করে যখন ক্লান্ত হয়ে যায় তখন তারা মৃত্যুকে চায় একটি নেয়ামত (সুখ) ও আরাম-স্বরূপ। সেজন্য মৃত্যুর রূপান্তর হচ্ছে নিদ্রা। নিদ্রা যাপনেও সাময়িকভাবে সেই সুখ লাভ হয়ে থাকে, যদি কারও ঘুম হয়। যদিও এরূপ অসুস্থ মহিলারা আমার কাছে (চিকিৎসার্থে) আসেন এবং কোন কোনো এরূপ অসুস্থ পুরুষও আসেন যারা উন্মাদনার কাছাকাছি পৌছে যান, এমন কি অনেকে অনিদ্রার দরুন উন্মাদ হয়েও যান। অথচ ঘুম মৃত্যুরই একটি রূপ। জীবন চেতনার নাম। সবসময় অবলোকন ও উপলব্ধি করতে পারাই হচ্ছে জীবন। অতএব, তারা কেন ঘুমোতে চান ? প্রকৃতপক্ষে তারা এক ধরনের মৃত্যুকেই চান। যখন তাদের ঘুম আসে না তখন মৃত্যু কামনা করে থাকেন। অনেক সময় বলেও থাকেন, আমাদের জন্য এখন মৃত্যু ঘটার জন্য দোয়া করুন, কেননা ঘুম আসছে না, অর্থাৎ মৃত্যু আসছে না। কাজেই দোয়া করুন যেন মৃত্যু এসে যায়। এটা একই শব্দের দু'টো সমার্থক অভিব্যক্তি। অতএব, আল্লাহ্‌তাআলার সত্তা যাঁকে তন্দ্রা পর্যন্ত স্পর্শ করে না, নিদ্রা কীভাবে স্পর্শ করবে ? নিদ্রা বিশ্রাম ও সুখানুভূতিরই অপর নাম। পরিশ্রান্ত মানুষের পক্ষে এর আবশ্যক হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলাকে কোনকিছু ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত করতে পারে না। কেননা, তিনি অনন্তকাল থেকে আছেন এবং অনন্তকালব্যাপী থাকবেন। তাঁকে কোন কিছু কেন ক্লান্ত করতে পারে না ? এর মাঝে এক গভীর হিকমত ও মাহাত্ম্য নিহিত। ক্লান্ত করার জন্য বহুবিধ পরিবর্তনের আবশ্যক হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যে-সত্তার মাঝে কোনও রকম পরিবর্তন ঘটে না, সে ক্লান্ত হয় না। যার মধ্যে পরিবর্তন ঘটে সে 'প্রথম বা আদি কারণ' সাব্যস্ত হয় না। এটা এক জটিল দার্শনিক-তত্ত্ব, যা বেশির ভাগ লোকই বুঝতে পারেন না, অথবা বাচ্চারা এবং যুবকরা বুঝতে পারবে না। শুরু থেকেই যাদের দর্শনে কৌতুহল নেই তারা এ বিষয়টির সূক্ষ্ম সূত্রসমূহ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। কিন্তু এটুকু সুনিশ্চিত যে, পরিবর্তনশীল সত্তায় মাত্রা-হ্রাস ও মাত্রা-বৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় তা হ্রাস-প্রাপ্ত হয়ে অবশেষে তার শক্তির অবসান ঘটবে।

অতএব, খোদা পরিবর্তন-মুক্ত হবার দরুন চিরস্থায়ী শক্তির অধিকারী। এবং তাঁর অক্ষয়-অব্যয় চিরস্থিতিশীল শক্তি সাব্যস্ত হয় নিখিল-বিশ্ব ব্যাপী সৃষ্টির চিরপ্রবহমান স্থিতিশীল অস্তিত্বের দরুন। সূরা বাকারায় আয়াতুল কুর্সিতে একটু গভীর নজর দিলে আপনারা দেখে বিস্ময়াবাক হবেন যে, কতো মহান এই আয়াত ! এ আয়াতটি বুঝে নিলে সমগ্র সৃষ্টির অস্তিত্ব-রহস্য বোধগম্য হয়ে পড়ে। এ আয়াতটি বুঝে নিলে খোদাতাআলাকে যদিও মানুষ (সম্যকভাবে) বুঝে উঠতে পারে না, কিন্তু এ প্রসঙ্গে তার উপর খোদা যতটুকুই প্রতিভাত হতে পারেন ততটুকু সুপ্রতিভাত হতে পারে আয়াতুল কুর্সির মধ্য দিয়ে। "লাহু মা ফিস্‌সামাওয়াতে ওয়া মা ফিল আর্‌য" – তিনি মালিক। যা-কিছু আকাশমালা ও পৃথিবীতে বিদ্যমান তা একমাত্র তাঁরই। একথাটিও এ আয়াতের আগের কথাগুলোর স্বাভাবিক ফলবিশেষ, যা নির্ণয় করা হয়েছে। যদি তাঁরই হয়ে থাকে, তাহলে তিনি ওগুলোর খেয়াল রাখবেন এবং (সেজন্যই) তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। কেননা, এ সবকিছুই তাঁর এবং এগুলোকে তাঁর সজীব রাখতে হবে।

"মান যাল্লাযী ইয়াশফাউ ইন্দাহু ইল্লা বি-ইয্‌নিহী" – কে সে, যে কিনা তাঁর সমীপে শাফা'আত (সুপারিশ) করতে পারে তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে ? যখন সবকিছু একমাত্র তাঁরই (তিনিই সবকিছুর মালিক,) তখন তাদেরকে ক্ষমা করাও তো তাঁরই সিদ্ধান্ত (-সাপেক্ষ) হবে। অতএব, যদি ক্ষমা তারই ফয়সালা সাপেক্ষ হয়ে থাকে তাহলে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ শাফাআত কীভাবে করতে পারে ? কারও ক্ষেত্রে ক্ষমা নির্ধারিত আছে কিনা, অথবা ক্ষমা করা সমীচীন কি-না এ ফয়সালা প্রথমে তিনিই (আল্লাহ্) করেন। এবং যাদের গোনাহ্ ক্ষমা করার সম্পর্কে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন যে, তাদের মধ্যে অনেক রকম দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে ঐ সব দুর্বলতার পরিণাম অর্থাৎ শাস্তি থেকে নিরাপদ রাখার বা নিষ্কৃতি পাবার তারা উপযোগী, এমতাবস্থায় যেহেতু এমন তো হতে পারে না যে, কোন মানুষের ভেতর দুর্বলতা না থাকে-কেননা 'বাশারীয়ত' (মানবসুলভতা) দুর্বলতারই অপর নাম, সেহেতু এই মানবীয় দুর্বলতাই হোক অথবা ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা, উভয় ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌তাআলাই সবচে' ভাল জানেন, সবকিছু তাঁরই সার্বভৌম ক্ষমতা ও সত্তাধীন যে, এগুলোর মধ্যে কাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং কাকে করবেন না। এখন, 'মালিকীয়ত' (সার্বভৌম ক্ষমতা ও সত্বাধিকার)-এর ক্ষমার সঙ্গে সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। কেননা, বিচারক আবার কোন কোন গোনাহ্ বা অপরাধ ক্ষমা করে দিতে পারেন না। পক্ষান্তরে, যিনি মালিক, তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন, তাঁকে সেজন্য কেউ প্রশ্ন করতে পারে না। যা ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করতে পারেন। তবে যা তিনি ইচ্ছা করেন বা চান, তা কেবল তা-ই চান যা হিকমত-ভিত্তিক, প্রজ্ঞাসম্মত হয়ে থাকে। কাজেই শাফা'আতের বিষয়-বস্তু এখানে সংক্ষেপে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ 'মান যাল্লাযী ইয়াশ্‌ফাউ ইন্দাহু ইল্লা বি-ইয্‌নিহী।'

এখন, 'মান'(কে) সম্পর্কে মনে রাখা দরকার যে এখানে শ্রেয়তঃ আঁ হযরত (সঃ)-কে বুঝায়। সে কে ? যাকে তিনি অনুমতি দিতে পারেন, এতদ্ব্যতীত যে, সে তিনি নিজেই, যিনি অনুমতি দিতে পারেন। এর অর্থ এই যে, যাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে তার ওপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে যে, তিনি (সঃ) কতকগুলো কারণ বা শর্ত সাপেক্ষে শাফা'আত করার উপযুক্ত। ঐ কারণ বা শর্তগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, তিনি এমন

কোন শাফা'আত বা সুপারিশ করতে পারে না, যা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি-বিরুদ্ধ হয়। কেননা, তিনি শাফা'আতের অধিকারই পেয়েছেন কেবল আল্লাহ্-তুষ্টি অন্বেষার ফলশ্রুতিতে।

অতএব, যিনি শতকরা একশ' ভাগই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির প্রতি দৃষ্টি রাখেন তিনি অবধারিতভাবে, যখনই শাফা'আত করবেন তখন এক কণা পরিমাণও এরূপ কথা বলতে পারেন না, যা তাঁর ক্ষেত্রে আল্লাহ্-তুষ্টির হাত-ছাড়া হবার কারণ ঘটায়। তিনি তো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির সাথে সম্পূর্ণ যুক্ত হয়ে আছেন।

দ্বিতীয়তঃ শাফা'আতের বিষয়-বস্তু, যেমন কিনা আমি মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এতদ্‌সংক্রান্ত কোন কোন উদ্ধৃতি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো। শাফা'আতের বিষয়-বস্তু 'শুফআ' অর্থাৎ 'দুই' হতে প্রস্ফুট বলে প্রতীয়মান হয়। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা কী তার আগে যখন আমি হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উদ্ধৃতিসমূহ উপস্থাপন করবো, তখন শাফা'আতের প্রকৃত অর্থ আপনারা হৃদয়ঙ্গম করবেন। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন, "ইয়া'লামু মা বায়না আইদীহিম ওয়া মা খাল্‌ফাহুম" – শাফা'আত যাদের কাম্য, ক্ষমা-প্রাপ্তি যাদের উদ্দেশ্য, তাদের অতীতও খোদাতাআলার কাছে সুস্পষ্ট এবং তাদের ভবিষ্যতকালও। শাফা'আত প্রসঙ্গে আয়াতের উক্ত অংশের এ অর্থটিও সাব্যস্ত হয় যে, কোনও কিছু যেমন খোদার দৃষ্টি থেকে গোপন নয়। তেমনি যাদেরকে শাফা'আতের অনুমতি দেয়া হবে তাদের অতীত কি ভবিষ্যত উভয় খোদার জ্ঞানগোচর রয়েছে। আয়াতের এ অংশটির আরও কিছু অর্থ আছে। সে সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত আলোকপাত করবো।

"ওয়া লা ইউহীতূনা বি-শায়িম্ মিন ইল্‌মিহী ইল্লা বিমা শায়া" - কেউ তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে তার জ্ঞানের কোন কিছু আয়ত্ত করতে পারে না। এর এ অর্থ নয় যে, ইচ্ছা ব্যতিরেকে আয়ত্ত করতে পারে না বরং যখন তিনি ইচ্ছা করেন কেবল তখনই আয়ত্ত করতে পারে। কেননা, তিনি বলেছেন, "ওয়ালা ইউহীতূনা বি-শাইয়িম্ মিন ইলমিহী ইল্লা বিমা শায়া"- ততোটুকুই সে আয়ত্ত করতে পারে যতোটুকু তিনি চান, আর যখন তিনি চাইবেন তখন আবার ততোটুকুও আয়ত্ত করার সৌভাগ্য ঘটবে না। এর অর্থ এই যে, জ্ঞানের জগতে মানুষ যতটুকুও উন্নতি লাভ করে থাকে তা-ও আল্লাহ্ পরিচালিত অমোঘ-নিয়তির অধীনেই করে থাকে। আপনা-আপনি মানুষের পক্ষে তো জ্ঞানগত উন্নতি লাভ করা তার সাক্ষাৎ বৈশিষ্ট্য নয়। প্রথমতঃ স্বভাবজ ক্ষমতাগুলোও খোদারই সৃষ্ট, যতক্ষণ পর্যন্ত তার ক্ষমতাগুলোকে খোদাতাআলা প্রত্যেক উপলক্ষ্যে অনুমতি না দেন এই বলে যে, এখন এই ক্ষমতাগুলোকে তুমি এই ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পার, ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলোর ব্যবহারে সে সফল হতে পারে না। অতএব, বিভিন্ন জ্ঞানের যে-সব অর্গল ইতিহাস আমাদের সামনে উন্মোচন করেছে সেগুলোর প্রত্যেকটি নতুন দুয়ার উন্মোচিত হবার সঙ্গে এ আয়াতের সম্পর্ক রয়েছেন –"ওয়া লা ইউহীতূনা বি-শায়িম্মিন ইলমিহী ইল্লা বি মা শায়া"–যখন তিনি চান তখন জ্ঞানের কোন নতুন দুয়ার খুলে দেন। এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তখনই চান, যখন মানুষের ক্ষেত্রে (সে জ্ঞানের) আবশ্যক হয়ে থাকে। অন্য কথায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চিরপ্রবহমান উন্নতি এ আয়াত-এ-করীমার সাথে, বিশেষতঃ উল্লেখিত আয়াতাংশের সাথে সম্পৃক্ত। অতঃপর বলেছেন, "ওয়াসে'আ কুরসিয়্যুহুস্ সামাওয়াতে ওয়াল্ আর যে"–'তাঁর আর্‌শ পৃথিবী এবং আকাশমালকে পরিবেষ্টন করে আছে'। আবার জ্ঞানকেও 'কুর্সি' বলা হয় এবং এখানে 'জ্ঞান' অর্থটির প্রয়োগও সমীচীন ও শুদ্ধ হবে – তাঁর জ্ঞান সমগ্র সৃষ্টিকে, নিখিল বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করেছে। "মা বাইনা আইদীহিম ওয়া মা খালফাহুম" – নশ্বর মানুষের পশ্চাতে এবং সম্মুখে যা ঘটবে কেবল তা-ই বুঝায় না, বরং সমগ্র সৃষ্টির অগ্র-পশ্চাতের সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে।

"ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফ্‌যুহুমা ওয়া হুয়াল 'আলিয়্যুল্ 'আযীম-এবং এই উভয়ের সংরক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না; বস্তুতঃ তিনি অত্যন্ত মর্যাদাবান, মহান।" এর পূর্ববর্তী বাক্যটিসহ এ আয়াতাংশ সম্পর্কে আমি ইন্‌শাল্লাহ্ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর লেখা থেকে এরূপ এক বিষয়-বস্তু তুলে ধরবো, যা ইতঃপূর্বে যথাসম্ভব কোন তফসীরকারের হৃদয়-পটে উদ্ভাসিত হয় নি। আর এটা এক মৌলিক অংশও বটে। এ বিষয়-বস্তুটি উপলব্ধি করা ব্যতিরেকে এ আয়াত-এ-করীমা বোধগম্যই হতে পারে না। সেজন্য এ বিষয়-বস্তুটি নিশ্চয় হযরত আকদস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওপরে ওহী করা হয়েছে, মূলতঃ তাঁর কাছেই সুপ্রতিভাত হয়েছে। কিন্তু এর বিস্তারিত বিবরণ যে-ভাবে প্রকাশ করা অবধারিত ছিল, তা এই যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ওপরে অর্পণ করা হয় এবং আল্লাহ্‌তাআলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে এ বিষয়-বস্তুটি বুঝিয়েছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এ সেই যুগ, যখন এ বিষয়-বস্তুটি হৃদয়ঙ্গম করা খোদার ওপরে ঈমান কায়েম রাখার জন্য আবশ্যকীয়। কেননা, এ বিষয়টির গুরুত্ব যদি আপনারা অনুধাবন না করেন, তাহলে এখন এমন এক যুগ এসেছে, যখন খোদার নাম উচ্চারণ করাও এক রকম অপরাধ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কবি আকবর ইলাহাবাদী (ব্যাঙ্গোক্তিস্বরূপ) বলেছিলেন, 'বৈরীরা থানায় রিপোর্ট লিখিয়েছে (কেইস দিয়েছে) যে, এই যুগে আকবর খোদার নাম উচ্চারণ করছে " –

"রকীবৌ নে রিপোর্ট লিখ্‌ওয়ায়ী হ্যয় জা জা কে থানে মেঁ কেহ্ আকবর নাম লেতা হ্যয় খোদা কা ইস্ যামানে মেঁ ॥" খোদার নাম নেবার এটাও কি কোন যুগ ! আর এই যুগ আজ থেকে অনেক আগের যুগ। বহুকাল আগেই তিনি মারা গেছেন। অতএব, বর্তমান যুগটির ওপর তো এই কথা অধিকতর প্রযোজ্য হয়। সুতরাং বাস্তবতঃ যে প্রবল আকারে এ বিশ্বের উপর নাস্তিকতার থাবা বিস্তার লাভ করেছে ইতঃপূর্বে সম্ভবতঃ এ দুনিয়াতে কখনও এরূপ ঘটনা ঘটে নি। কাজেই এখন প্রয়োজন আয়াতুল-কুর্সিতে নিহিত বিষয়-বস্তুগুলোকে বিশদভাবে তুলে ধরার। এ যুগেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আয়াতুল-কুর্সির ওপর সিদ্ধ হস্তে কলম ধরেছেন এবং গভীর তত্ত্বপূর্ণ সুবিস্তৃত আলোকপাত করেছেন তাঁর গ্রন্থাবলীতে এবং তাঁর বক্তব্য-বক্তৃতা সম্বলিত 'মলফুযাতে'-ও।

সংক্ষেপে এই ব্যাখ্যাগত তরজমা পেশ করার পর আমি এখন একটি হাদীস আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। হযরত ইবনে আস্‌কা' (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সঃ) 'আসহাবে সুফ্‌ফা'র নিকটে গেলে তাদের মধ্যে একজনের প্রশ্নের যে উত্তর দান করেন তা তিনি (রাঃ) শ্রবণ করেন। সে উত্তরটির সম্পর্ক ছিল আয়াতুল-কুর্সির সঙ্গে। একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কুরআন করীমের কোন্ আয়াতটি সবচে' মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ ?' নবী করীম (সঃ) বলেন, 'আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম লা তা'খুযুহু সিনাতুও ওয়ালা নাওম।' (সুনান আবি দাউদ, কিতাবুল হুরূফ ওয়াল কারায়াত)। অর্থাৎ, যে আয়াতের অংশবিশেষ তিনি (সঃ) পাঠ করলেন তা কুরআন করীমের সবচে' মহান আয়াত। ইহা স্পষ্ট যে, কুরআন করীমের বিষয়-বস্তু যেহেতু সর্বতোভাবে 'আল্লাহ্' শব্দটিকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান সেহেতু, যে-আয়াতে আল্লাহ্ সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা বিদ্যমান যে, ওরূপ বর্ণনা দুনিয়ার কোনও কিতাবে খুঁজে পাওয়া না যায়, সে আয়াতটিই তো সবচে' মহান (সাব্যস্ত হয়)।

তেমনি সুনান আত্ তিরমিযী, আবওয়াব ফাযায়িলুল কুরআন'-এ এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, 'প্রত্যেক বস্তুর একটি চূড়া থাকে এবং কুরআন করীমের চূড়া হচ্ছে সূরা বাকারাহ্। আসলে চূড়ার বিপরীতে যে-শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে তার তরজমা দাঁড়ায় 'কুঁজ'। অতএব, উটের যেমন কুঁজ থাকে, যা উটের দেহে সবচে' উঁচু হয়ে থাকে, তেমনি কুরআন করীমের শীর্ষস্বরূপ হচ্ছে সূরা বাকারাহ্ এবং এ সূরাটিতে একটি মহান আয়াত আছে, যা কুরআন করীমের আয়াতসমূহের সরদার বিশেষ। তা হচ্ছে আয়াতুল-কুর্সি। সুতরাং এ আয়াতটির কারণে সূরা বাকারা শীর্ষস্থানীয় সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা, সবচে' উঁচু সমস্ত কুরআনের মাঝে যা বিদ্যমান তা হলো এ আয়াতটি এবং যে সূরায় তা বিদ্যমান তা কুরআনেরও কুঁজস্বরূপ সাব্যস্ত হলো।

আরেকটি হাদীস 'মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফেরীন' হতে গৃহীত, অর্থাৎ সহী মুসলিম গ্রন্থের উক্ত অধ্যায়াধীনে এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ আছে। হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, হে আবূ মুনযির ! তোমার কাছে বিদ্যমান অংশে কিতাবুল্লাহ্র মাঝে কোন্ আয়াতটি সবচে' মহান ? আমি নিবেদন করলাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই সবচে' ভাল জানেন। হুযূর পাক (সঃ) বল্লেন, হে আবূ মুনযির ! তুমি কি জান যে, কিতাবুল্লাহ্র যে অংশ তোমার স্মরণ আছে তার মধ্যে কোন্ আয়াতটি সর্বশ্রেষ্ঠ ? যেমন ধাঁ ধাঁ উপস্থাপনের বেলায় কোন সময় তাতে কিছু ইঙ্গিত দেয়া হয়, যাতে ধাঁ ধাঁর উত্তরদাতা বিষয়-বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বা রহস্যটি পেয়ে যায়। তেমনি ধারায় রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর প্রশ্নটি শোনা মাত্র অবলীলায় তিনি (রাঃ) বল্লেন, "যেটুকু অংশ আমার মুখস্ত আছে তাতে 'লা ইলাহা ইল্লালাহু আল্ হাইয়্যুল কাইয়্যুম' – আয়াতটি নিঃসন্দেহ মহোত্তম।" অন্যান্য বিষয় ব্যতীত হাদীসটি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, হাদীসটি একশ' ভাগ সত্য। কেননা, প্রত্যেক সাহাবীর, বিশেষতঃ আবূ মুনযির উবাই বিন কা'বের (রাঃ) তো গোটা কুরআন মুখস্তই ছিল না। তিনি কীরূপে বলতে পারতেন যে, সমস্ত কুরআনের ইহা মহোত্তম আয়াত ? কুরআনের যেটুক তাঁর মুখস্ত নেই তার মধ্যে কে জানে কত কী কী জিনিস থাকতে পারে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমার বুকের ওপর হাত রাখলেন এবং বললেন, "আবূ মুনযির ! জ্ঞান তোমার জন্য মুবারক হোক। এ আয়াত (অর্থাৎ আয়াতুল-কুর্সি) হচ্ছে জ্ঞানের উৎস।" অতএব, তাঁর এ বাণীতে একটি ইঙ্গিত ছিল যে, এ আয়াতটিতে গভীর চিন্তা-ভাবনা করতে থেকো। তাতে তোমার অন্তঃকরণকে আল্লাহ্তাআলা জ্ঞানরাশীর দ্বারা ভরে দিবেন। এবং এর এ অংশটির দিকে বিশেষভাবে ইঙ্গিত ছিল ঃ 'ওয়া লা ইউহীতূনা বিশাইইম মিন ইলমিহী ইল্লা বিমা শায়া" অর্থাৎ, তারা তাঁর জ্ঞানের কোন একটি অংশকেও আয়ত্ত করতে পারে না, কেবল তা ব্যতীত, যা আল্লাহ্ চান, তারা জানুক। ততটুকুই তারা জ্ঞান লাভ করবে যতটুকু এবং যখন খোদা তাদেরকে দান করবেন।

এখন, এ আয়াতে করীমায় আল্-হাইয়্যু এবং আল্-কাইয়্যুম এ দু'টো শব্দে আল্লাহ্তাআলার দু'টি গুণবাচক নাম বর্ণিত হয়েছে।-'লা ইলাহা ইল্লা হুয়া আল্-হাইয়্যুল্ কাইয়্যুম।' এখন আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর রচনার অংশ বিশেষ থেকে উক্ত দু'টি শব্দের আরও ব্যাখ্যা তুলে ধরছি। আল্ হাকাম ৬ষ্ঠ খন্ড, সংখ্যা ১০, ১৭ই মার্চ, ১৯০২, পৃঃ ৬-এ লিপিবদ্ধ আছে ঃ "জানা দরকার পবিত্র কুরআন আল্লাহ্তাআলার দু'টি নাম উপস্থাপন করেছে আল্-হাইয়্যু এবং আল্-কাইয়্যুম। আল্-হাইয়্যু-এর অর্থ হচ্ছে, ঐ সত্তা, যিনি নিজে জীবিত এবং অন্যান্যদের জীবনদাতা।" 'নিজে জীবিত এবং অন্যান্যদের জীবনদাতা'-এ অর্থ তিনি কী ক'রে নির্ণয় করলেন ? তা এজন্য যে, 'আল্লাহ্'-শব্দের পরে এ শব্দটি এসেছে। আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয়। অতএব, তিনি ব্যতীত অন্যান্য যাদেরকে জীবিত দেখা যায় তা এ জন্যই দেখা যায় যে, তিনি এরূপ জীবিত, যিনি তাঁর জীবন থেকে অন্যান্যদেরকেও অংশ দান করে থাকেন। কেননা, তিনি ব্যতীত যেহেতু আর কোন কিছুই (প্রকৃতপক্ষে) অস্তিত্বান নয় সেহেতু জীবিত জিনিস কী ক'রেই বা পরিদৃষ্ট হচ্ছে বা হতে পারে ? অতএব, একারণেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আল্-হাই-এর এই ব্যাখ্যা করেছেন। এটা বলেন নি যে, আল্লাহ্ জীবিত, বরং বলেছেন, জীবিত এবং অন্যদের জীবনদানকারী। অনুরূপভাবে নির্ণয় করে তিনি (আঃ) বলেছেন, "আল্-কাইয়ুম হচ্ছেন যিনি নিজে কায়েম এবং অন্যান্যদের প্রতিষ্ঠালাভের মূলকারণ। প্রত্যেক বস্তুর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠা এবং জীবন আল্লাহ্তাআলার উক্ত দু'টি সিফ্ত বা গুণের বদৌলতেই বটে।" অর্থাৎ দুনিয়াতে প্রত্যেক বস্তুর যে অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাই, তা ওগুলোর বাহ্যিক প্রতিষ্ঠাই পরিদৃষ্ট হয়। আর এই বাহ্যিক প্রতিষ্ঠাও তো আল্লাহ্তাআলার ফয়সালার ওপরেই নির্ভরশীল। যে যতটুকু প্রতিষ্ঠা চায়, ততটুকু তিনি তাকে দান করেন। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে যে যতটুকু চায়-এ কথাটিতে দু'টি অর্থ নিহিত। এক, প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা ও স্থিতি অন্য কোনও ব্যক্তির সমান নয়। প্রত্যেকের ক্ষমতা ও গুণাবলী ভিন্ন ভিন্ন এবং ঐ গুণাবলীর ওপর প্রতিষ্ঠাও ভিন্নতর। এ সম্পর্কে অত্যন্ত বিশদ ও বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা যেতে পারে। দুই, অভ্যন্তরীণ (বাতেনী) প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উহার গভীরতাকেও বুঝায় এ অর্থে যে. আল্লাহ্তাআলা কাউকে কতোটুকু গভীরতায় কতোটুকু প্রতিষ্ঠা ও স্থিতি দান করেন। অতএব, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসমূহের মাঝে এই যাবতীয় অর্থ নিহিত থাকে এবং তাঁর রচনাবলী এজন্যই সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্যক বুঝে ওঠা কঠিন হয় যে, এক একটি বাক্যের ওপর থেমে থেমে তা হৃদয়ঙ্গম করার প্রয়োজন মত তার সময় হয়ে ওঠে না অথবা মানুষ ততোটুকু মনোযোগ দিত পারে না যাতে সে-বিষয়ের গভীরে নেমে প্রত্যক্ষ করে।

তিনি (আঃ) বলেন, "প্রত্যেক বস্তুর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠা ও জীবন আল্লাহ্তাআলার এ দু'টি সিফ্ত বা গুণের বদৌলতেই বটে। অতএব, 'হাই' গুণটি চায় তাঁর ইবাদত যেন করা হয়। যেমন, এরই স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে সূরা ফাতিহায় 'ইয়্যাকা না'বুদু' এবং আল্-কাইয়্যুম' চায় তাঁর নিকট যেন সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রার্থনা করা হয়। তা ব্যক্ত করা হয়েছে 'ইয়্যা কানাস্তাঈন'-এর দ্বারা।" এখন, এটি হচ্ছে একটি প্রতিপাদন, যা আবার উপলব্ধি করা কঠিন, যা যেনো-তেনো প্রত্যেকের কাজ নয়। তবে এ-ও আল্লাহ্তাআলারই অনুগ্রহ, যদি কেউ এ সকল বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক জেনে যায়। অতএব, আল্লাহ্তাআলাই এর জ্ঞান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে দান করেছিলেন। তারপর তিনি যা উপলব্ধি করেছিলেন তা সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। কিন্তু আমাদের করণীয় হচ্ছে ধীর-সুস্থে সবিস্তারে মনোনিবেশে যেন প্রত্যক্ষ করি - কী সম্পর্ক নিহিত, তা অনুধাবন করি। যেমন, তিনি বলেছেন, "আল্-হাই শব্দটি চায় তাঁর ইবাদত যেন করা হয়।" ইবাদতের সঙ্গে 'হাই' শব্দটির কী সম্পর্ক ? এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, গোলাম বা কৃতদাসের নিজের বলতে কিছু থাকে না। তার জীবনের সম্পূর্ণটা-ই নির্ভর করে থাকে তার মালিকের ইচ্ছার ওপর। অর্থাৎ যদিও আব্দ্ বা দাস দুনিয়াতে এ ধরনেরও হবে যারা ভেগে যেতে পারে এবং নিজেদের জীবন নির্বাহের পথ মালিকের ব্যবস্থার বাইরেও খুঁজতে পারে। কিন্তু যারা আল্লাহ্র আব্দ্ তারা বাহ্যিকভাবেই আব্দ্ হোক, কিম্বা প্রকৃত আব্দ্-তাদের পক্ষে সম্ভব নয় যে,

তারা তাদের জীবন খোদাতাআলার ইচ্ছার ব্যতিক্রমে ও ব্যতিরেকে কায়েম রাখতে পারে। অতএব, এই হচ্ছে আব্দের সঙ্গে জীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক। তাই তিনি বলেন, 'হাই' শব্দটি চায় তাঁর ইবাদত করা হোক, যেমন এরই প্রকাশস্থল বা অভিব্যক্তি হচ্ছে সূরা ফাতিহায় --ইয়্যাকা না'বুদু'। এ প্রসঙ্গে অন্যত্র বিশদভাবে বর্ণিত বিষয়-বস্তুর দিকে এখানে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, হে খোদা ! কেবল তোমারই ইবাদত করি অর্থাৎ ইহা উপলব্ধিও করে থাকি যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ জীবনের অধিকারী-ই নয়। সব-কিছু একমাত্র তাঁরই। তিনি হচ্ছেন মালিক। 'মালেকে ইয়াওমিদ্দীন'-বাক্যটির পরে পরেই 'ইয়্যাকা না'বুদু' বাক্যটি আসে। অতএব, খোদাতাআলার যারা প্রকৃত বান্দা– যারা আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত, তারা প্রার্থনা করে এসেছেন এবং ঐ বান্দারাও, যারা প্রকৃতপক্ষে জীবিত নয়, কেবল বাহ্যিকভাবে জীবিত, তারা যখন এ বিষয়টি অনুধাবন করে তখন অবলীলাক্রমে তাদের মুখ দিয়েও উচ্চারিত হয়–ইয়্যাকা না'বুদু।

এখন, যেখানে বাহ্যিকের সম্পর্ক, সেখানে কোন সময় এ কালাম 'বাহ্যিকাবস্থার (রূপকভাবে) মুখ নিঃসৃত কথা বা ভাষা বলে অভিহিত হয়ে থাকে। মুখে তারা স্বীকারোক্তি করুক বা না করুক, জীবন তারা আল্লাহ্‌র কাছেই তালাশ করে থাকে। এখন, যেমন দুনিয়াতে যতো খাদ্যের বিশেষজ্ঞ রয়েছেন তারা সম্ভাব্য অধিকতম মাত্রায় খাদ্য সংগ্রহ সম্পর্কে পরিকল্পনা চিন্তা করেন এবং বড় বড় বৈজ্ঞানিক প্রচ্ছন্ন জ্ঞান উদ্ভাবন-উদ্‌ঘাটন করে থাকেন যাতে মানুষের খাদ্য-ঘাটতি সমস্যার সমাধান হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে তো ঐ সমস্ত খাদ্যভান্ডার আল্লাহ্‌রই সৃষ্ট। অতএব, তারা মুখে উচ্চারণ করুক বা না করুক, মানুক বা না মানুক, অন্য আর কোন দুনিয়া-ই নেই, যেখান থেকে তারা খাদ্যান্বেষণ করতে পারে। যে দুনিয়া আছে তা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট এবং 'ইয়্যাকা না'বুদু' -ধ্বনি তাদের অবস্থার মুখ নিঃসৃত ভাষায় সর্বক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু কতো হতভাগ্য তারা যে, এ বাক্যটি উচ্চারণ করে তারা এ সত্যটির স্বীকারোক্তি করার তওফীক পায় না। কেবল তারা তওফীক পায়, যাদের কাছে আধ্যাত্মিক জীবনই পার্থিব জীবনের চে' অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর 'ইয়্যাকা না'বুদু' এবং সেই সঙ্গে যে 'ইয়্যাকা নাস্ তাঈন' রয়েছে তাতে এ বিষয়-বস্তুও নিহিত যে, যখন আমরা বলি যে, সূরা ফাতিহা সমস্ত কুরআনের মা বা উৎসস্বরূপ এবং সূরা ফাতিহায় সবকিছুই অন্তর্নিহিত রয়েছে, তখন আয়াতুল-কুর্সি তার চেয়েও মহোত্তর কী ক'রে হলো ? আসলে আয়াতুল-কুর্সি'র প্রাণবস্তুও সূরা ফাতিহাতেই নিহিত। অতএব, সূরা ফাতিহার মোকাবেলায় উহা দন্ডায়মান নয়। সূরা ফাতিহা তো জীবন প্রদানকারী। এর মধ্যে নিহিত বিষয়াবলী থেকে উপকারগ্রহণকারী হচ্ছে আয়াতুল-কুর্সি। অর্থাৎ আয়াতুল-কুর্সি'র মাঝে বর্ণিত যাবতীয় বিষয়-বস্তুর নির্যাস সূরা ফাতিহাতে বিদ্যমান। অতএব, কেউ যেন ইহাকে স্ববিরোধ বলে মনে না করে যে, এক দিকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন যে, সূরা ফাতিহাই সবকিছু এবং অন্য দিকে আয়াতুল-কুর্সি সম্পর্কে বলেন যে, উহাই সব কিছু। এ দু'টি কথার মাঝে প্রকৃতপক্ষে কোনও স্ব-বিরোধ নেই। উল্লিখিত তত্ত্বটির আলোকে আমরা বুঝতে পারছি যে, কোন স্ববিরোধ নেই। এ বিষয়টি অনুধাবন করার চাবিকাঠিস্বরূপ হচ্ছে 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন।

তিনি (আঃ) বলেন, "এবং 'আল্ কাইয়্যুম' চায় তাঁর কাছে যেন পৃষ্ঠপোষকতা প্রার্থনা করা হয়।" কেননা, ঠেস বা পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতিরেকে কোন জিনিস টিকে থাকতে পারে না। লব্ধ জীবনকে কায়েম রাখার জন্য পৃষ্ঠপোষকও তো চাই। পৃষ্ঠপোষক শব্দটির 'কাইয়্যুম'-এর সাথে মিল আছে। আর 'কাইয়্যুম' শব্দের অপর অভিব্যক্তি ঘটে থাকে 'ইয়্যাকা নাস্তাঈন'-এর মাধ্যমে। (অর্থ দাঁড়ায় এই যে,) জীবনও তোমার কাছ থেকে পেয়ে থাকি। তুমি ব্যতীত আর কে আছে জীবনদাতা ? এই জীবনকে যতক্ষণ এবং যে পরিমাণ তুমি চাইবে, কায়েমও রাখবে। সেজন্য 'ইয়্যাকানাস্তায়ঈন' ব'লে পৃষ্ঠপোষণসূলভ যাবতীয় উপকরণ দ্বারা উপকৃত হবার জন্য প্রার্থনা করা হয়। অতএব, 'ইয়্যাকা নাস্তাঈন'-এর মাঝে 'কাইয়্যুম'-এরই বিষয়-বস্তু নিহিত রয়েছে। কাজেই তিনি (আঃ) বলেছেন, "আল্-কাইয়্যুম চায় তার কাছে পৃষ্ঠপোষকতা যেন প্রার্থনা করা হয়। তা প্রকাশ বা ব্যক্ত করা হয় 'ইয়্যাকা নাস্তাঈন'-এর দ্বারা" অতএব পৃষ্ঠপোষকতা তো বিদ্যমান। প্রত্যেক জিনিস যদিও তাঁরই ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এ উদ্ধৃতিটিতে আমাদেরকে মনোযোগী করা হয়েছে, সেজন্য যেন প্রার্থনা করা হয়।

এমন কত অসংখ্য লোক আছেন যারা নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করে থাকেন, অবশ্য-অবশ্য সবাই করে থাকেন। যিনি মুসলমান এবং নামায পড়ে থাকেন কিন্তু সূরা ফাতিহা পাঠ করেন না-এমন কেউ হতে পারে না। কিন্তু তারা উক্ত বিষয়-বস্তুটি হৃদয়ঙ্গম ক'রে পাঠ করেন না। এ বিষয়টির দিকে দৃষ্টি দেন না যে, আল্লাহ্ পৃষ্ঠপোষক বটে, কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতা তাঁর কাছে চাইতে হবে। যারা যতো চাইবে তারা ততো বেশী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে থাকবে। তোমাদের সার্বিক উন্নতি 'চিরস্থায়ী পৃষ্ঠপোষকে'র কাছে সদা পৃষ্ঠপোষকতার জন্য প্রার্থনার মাঝে নিহিত।

তারপর, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) 'সিনাতু ওয়া লা নাওম'-বাক্যটিতে মালেকীয়তের সঙ্গে তন্দ্রা এবং নিদ্রার এক গভীর সম্পর্কের কথা বর্ণনা করেন। এ বিষয়ে আগেও আমি কিছু আলোচনা করেছি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এরই বক্তব্যের উদ্ধৃতি-মূলে। এখন এ বিষয়ে তাঁরই উদ্ধৃতির মাধ্যমে আরও কিছুটা আলোকপাত করবো। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়-বস্তুটি আমাদের ওপরে আলোকসম্পাত করে। কিন্তু আমার আলোকপাত করার একটি অর্থ হচ্ছে যে, আমি তা আপনাদের কাছে খোলাসা ক'রে বর্ণনা করছি। এর বেশী কিছু নয়।

"প্রকৃত অস্তিত্ব এবং প্রকৃত স্থায়িত্ব" –আল্-হাইয়্যুল্ কাইয়্যুম-ইহা আপাতঃ আগেই বর্ণনা করা উচিত ছিল। কেননা, আল্-হাইয়্যুল কাইয়্যুম-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি (আঃ) মালেকীয়ত সংক্রান্ত বিষয়টিও বর্ণনা করেছেন এবং নিদ্রা ও তন্দ্রা সংক্রান্ত বিষয়টিও। সেজন্যে তা আমি এই শিরোনামের অধীনে রেখেছি। তিনি বলেন, "প্রকৃত অস্তিত্ব ও প্রকৃত স্থায়িত্ব এবং প্রকৃত গুণাবলী সম্পূর্ণভাবে খোদারই জন্য নির্দিষ্ট। এগুলোতে তাঁর শরীক (অংশীদার) নেই। সাক্ষাৎভাবে কেবল তিনিই জীবিত। বাকী সমস্ত জীবিতরা তাঁর থেকেই জীবন-প্রাপ্ত এবং একমাত্র তিনিই সাক্ষাৎভাবে স্বীয় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত, চিরস্থিতিশীল। বাকী সমস্ত কিছুর প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব তাঁর পৃষ্ঠপোষণে নির্ভরশীল। আর যেমন মৃত্যু তাঁর জন্য 'জায়েয' নয়, তেমনি তাঁর কোন ইন্দ্রিয়ের তথা গুণের সামান্যতম রহিত হওয়াও, তা নিদ্রা ও তন্দ্রা জাতীয় হোক না কেন, তা-ও তাঁর ক্ষেত্রে বৈধ নয়।" এখানে 'জায়েয বা বৈধ নয়'-কথার অর্থ তো এ নয় যে, খোদার জন্যও কেউ শরীয়ত রচনা করে রেখেছে এই বলে যে, ইহা জায়েয এবং উহা জায়েয নয়। খোদাতাআলার নিজস্ব বিধান রয়েছে, আর তা হচ্ছে তাঁর গুণাবলীর নাম। যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করেন তাহলে প্রকৃতপক্ষে শরীয়তও হচ্ছে ঐশীগুণাবলীরই বহির্প্রকাশের নাম। সুতরাং এর অর্থ হচ্ছে যে, আল্লাহ্ নিজের জন্য অনুমোদন করেন না যে, তাঁর পক্ষে নিদ্রা ও তন্দ্রা জাতীয় কোনও ইন্দ্রিয় কখনও সামান্যতমও রহিত হতে পারে। তা কখন সম্ভব নয়। অন্যদের ন্যায় তাঁর ওপর কখনও মৃত্যু বা ধ্বংস নেমে আসে না, তেমনি তাঁর কখনও নিদ্রা ও তন্দ্রাও আসে না।"

অতএব মৃত্যুরই একটি রূপ বা প্রকার হচ্ছে নিদ্রা এবং তন্দ্রা। এ সম্পর্কে আমি পূর্বে সবিস্তারে বর্ণনা করে এসেছি। তিনি (আঃ) বলেন,

"পৃথিবীতে বা আকাশে যা কিছু তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে তা সবকিছু তাঁরই এবং তাঁর মাধ্যমেই প্রকাশমান এবং স্থিতিশীল।" অতএব, মালিকের এই ব্যাখ্যা যে, (বিশ্ব-জগত) যা কিছু (আছে তা) সবই যখন তাঁর মাধ্যমে স্থিতিশীল, তাঁর দ্বারাই জীবিত, তখন অবধারিতভাবে ঐ সব কিছুরই মালিকও তিনিই। অন্য কেউ মালিক হতেই পারে না। অতঃপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "কে আছে যে, তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর সম্মুখে শাফাআত করতে পারে ? যা মানুষের সম্মুখে বিদ্যমান এবং পশ্চাতেও তা তিনি জানেন অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতকে পরিবেষ্টন করে আছে।" অর্থাৎ, যা মানুষের জ্ঞানের অদৃশ্য, তা মানুষের নিজের সম্পর্কে হোক কিম্বা বহির্বিশ্ব সম্পর্কে, ঐ যাবতীয় অদৃশ্য বিষয় এ আয়াতে-করীমায় বর্ণিত হয়েছে। "এবং কেউ তাঁর জ্ঞানের কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি চান।" (চশমা-এ-মা'রেফত, পৃঃ ২৬১, ২৬২)। এখন, 'বিমা'-এর যে তরজমা আমি করেছিলাম, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর তরজমা হুবহু উহারই সমর্থন করছে। "আয়ত্ত তো করতেই পারে না, কিন্তু উহার যতটুকু তিনি চান।" অতঃপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি এবং তা এ আয়াতের যে অংশের ব্যাখ্যায় বর্ণিত তা হচ্ছে ঃ 'আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহুয়া আল্ হাইয়্যুল্ কাইয়্যুমু লা তা'খুযুহূ সিনাতুও ওয়ালা নাওম।' তিনি বলেন, "এখন ন্যায়বিচারের দৃষ্টিতে দেখা দরকার যে, কতো হৃদয়গ্রাহী যৌক্তিকতা, কতো সূক্ষ্ম প্রাঞ্জলতা, কতো গাম্ভীর্য এবং হিকমত ও প্রজ্ঞার সাথে এ আয়াতটিতে বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে।" আমি শুরুতে বলেছিলাম যে-জ্ঞানের অভাবে যে, অজ্ঞানতা দুনিয়ার ওপর ছেয়ে পড়েছে, এর ফলশ্রুতিতে এ যুগটি হচ্ছে নাস্তিকতার যুগ। কিন্তু এ আয়াতটিতে নাস্তিকতার বিরুদ্ধে এরূপ একটি যুক্তি উপস্থিত করা হয়েছে, যা কারও পক্ষে এতটুকুও খন্ডন করার জো নেই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এ আয়াতটি থেকেই যা কিনা পরিপূর্ণ জ্ঞানের উৎস, এই যুক্তি-প্রমাণ উন্মোচন করেছেন। "ন্যায়বিচারের মুক্ত দৃষ্টিতে দেখা উচিত যে, কত প্রাঞ্জলতা কত সূক্ষ্মতা কত গাম্ভীর্য ও প্রজ্ঞার সাথে"–কোন সময় অনেক বড়ো যুক্তি-প্রমাণ যখন বর্ণনা করা হয়, তখন সেই সাথে এক প্রকার আবেগ ও জোশও এসে যায়। কিন্তু খোদার মাঝে তো কোন আবেগ-উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয় না। তিনি অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছেন। মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলছেন যে, আয়াতটিতে আল্লাহ্ বড়ই গাম্ভীর্য ও প্রজ্ঞার সাথে এ কথাগুলো বর্ণনা করেছেন। এই যুক্তির মধ্যে অনেক গভীর হিকমত ও প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে যা উপলব্ধি করতে হবে। যদি গভীর মনোনিবেশে লক্ষ্য কর তাহলে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। "এ আয়াতটিতে বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে। এবং কীভাবে কয়েকটি মাত্র শব্দের মাধ্যমেই কত বিপুল অর্থ ও তাৎপর্য এবং কত গভীর ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের কথা, প্রজ্ঞার কথা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা হয়েছে। যার দৃষ্টান্ত আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এবং 'মা ফিস্ সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরয্' (যা কিছু আসমানসমূহে আছে এবং পৃথিবীতে আছে) - কথাটির মধ্যে এমন প্রজ্ঞাময় যুক্তি দ্বারা একজন স্রষ্টার অস্তিত্ব এবং তার পরিপূর্ণ গুণাবলী প্রমাণিত করা হয়েছে, যার পূর্ণ ও সমগ্র ব্যাপক বর্ণনার ন্যায় বর্ণনা আজও পর্যন্ত কোন দার্শনিক দিতে পারেন নি।" এখানে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 'ওয়া লা ইউহী তূনা বিশায়ইন'-এর মধ্যে যে 'আয়ত্ত করা' শব্দ এসেছে এর ব্যাখ্যার বর্ণনায় তিনি বারবার ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, মানুষ ইচ্ছা করলে এদিকে মনোযোগী হয়ে তাতে আরও নিমগ্ন হয়ে এর দ্বারা অধিকতর উপকার লাভ করতে পারে। অতঃপর তিনি (আঃ) বলেন ঃ "আজ পর্যন্তও কোন দার্শনিক অনুরূপ বর্ণনা দিতে পারেন নি। বরং দার্শনিকদের ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞান এটা উপলব্ধি করতে পারে নি যে, আত্মা এবং দেহ উভয়ই সৃষ্ট (হাদেস)। এবং তারা এই সূক্ষ্ম রহস্য থেকেও বেখবর যে, প্রকৃত জীবন, প্রকৃত অস্তিত্ব এবং প্রকৃত স্থায়িত কেবল খোদার জন্যই নির্দিষ্ট।" ইহা সেই নিশ্চিৎ যৌক্তিক প্রমাণ, যা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে। এখন দু'তিন মিনিটের মধ্যে, খুতবার যেটুকু সময় হাতে আছে, এ অংশটি আমি আপনাদের কাছে খোলাসা ক'রে বর্ণনা করছি। তিনি বলেন, "সত্যিকার বা প্রকৃত অর্থে যে জীবন ও জীবনের স্থায়িত্ব তা শুধু আল্লাহ্রই মাঝে নিহিত, যিনি সকল পূণ গুণাবলীর আধার। তিনি ছাড়া আর কেউ-ই নেই, যে প্রকৃত অস্তিত্ব ও প্রকৃত স্থায়িত্বের অধিকারী। এবং এ বিষয়টাই এই বিশ্বের একজন স্রষ্টা থাকার আবশ্যকতার পক্ষে যুক্তি হিসেবে পেশ করা হয়েছে" (বারাহীনে আহ্মদীয়া, ৪র্থ খন্ড)।

'হাদেস' বা সৃষ্ট সে-ই হয়ে থাকে যা চিরকাল থেকে বিদ্যমান নয়, বরং যা সংঘটিত হয় এবং পরিবর্তনশীল অস্তিত্ব লাভ করে । সংঘটিত ও অস্তিত্ব লাভকারী বস্তু-সত্তা সাক্ষাৎভাবে যদি অনেক সূক্ষ্ম জটিলতা, গভীরতা এবং বিরাট-ব্যাপক শৃঙ্খলাপূর্ণ কাঠামো সম্পন্ন হয়, তাহলে তা 'হাদেস' (সংঘটিত ও পরিবর্তনশীল) হতেই পারে না এতদ্ব্যতীত যে, অন্য কেউ তাকে সৃষ্টি করে। অতএব যখন সমগ্র বিশ্ব-জগৎ এবং এর বস্তুনিচয়-ই 'হাদেস' বিশেষ, তখন এর এই হাদেস হবার এ অর্থটিও তো উপলব্ধি করুন যে, পূর্বে তা ছিল না, পরে অস্তিত্ব লাভ করেছে। অতএব, যখন ছিল না এবং (নাস্তি থেকে) অস্তিত্ববান হয়েছে, তখন এরূপেই হয়েছে যে, এর মধ্যে থাকছে বহু রকম সূক্ষ্ম জটিলতা, শৃঙ্খলতা এবং সুবিন্যস্ত রূপ। এমতে ইহা স্পষ্ট যে, এর জন্য ইতঃপূর্বে কোন মহাপ্রজ্ঞাবান সত্তার বিদ্যমানতা অপরিহার্য, যিনি সুগভীর ও সম্যকভাবে তার মধ্যে বিদ্যমান ঐ যাবতীয় বিষয়গুলোকে বোঝেন এবং জানেন। নচেৎ তিনি ঐ সব জিনিস ওর ভেতর ঢোকাতেই পারেন না। কোন চিত্রশিল্পী এরূপ কোন চিত্র অঙ্কণ করতে পারে না-শিশুদের তৈরী চিত্র তো ভিন্ন ব্যাপার কিন্তু যে-চিত্র সারগর্ভ এবং প্রকৃত অর্থে চিত্র হয়ে থাকে, যা উপলব্ধি করার জন্যেও উন্নত পর্যায়ের চিত্রকরের দরকার হয়ে থাকে। কেননা, চিত্রটি আঁকার সময় চিত্রকারের মন-মস্তিষ্কে যে-সব বিষয় কাজ করে তা সাধারণ দর্শক পুরোপুরি বুঝতেও পারে না, কিন্তু তার বিষয়-বস্তু (প্রকৃতপক্ষেই) অত্যন্ত গভীর হয়ে থাকে। সুতরাং অনেক সময় আর্ট গ্যালারীগুলোতে একটিমাত্র ছবির সামনে কোন কোন লোক বসে থেকে সারা দিন ওখানেই কাটিয়ে দেয় এবং বেড়াবার উদ্দেশ্যে যারা যায় তারা ওদের দেখে ভাবে যে, ওরা কেন বসে আছে! ভ্রমণকারী দর্শকরা তো দেখতে দেখতে গ্যালারী অতিক্রম করে যায়। অথচ সেখানে থেমে থাকায় যে-সব বিষয় দৃষ্টিগোচর ও বোধগম্য হতে পারে তা ভাসা-ভাসা দেখে অতিক্রম করে যাওয়াতে হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে আমি আগামী খুতবায় পরবর্তী উদ্ধৃতির বেলায় একজন বিখ্যাত চিন্তাবিদের বক্তব্যও বর্ণনা করবো, এ বিষয়টির সঙ্গে যা গভীরভাবে সম্পৃক্ত। কিন্তু এখন যেহেতু সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। কাজেই ইনশাআল্লাহ্, অবশিষ্ট কথাগুলো আগামী খুতবার জন্যে রেখে দিলাম। তখন এ আয়াতে করীমা (আয়াতুল-কুর্সি) সম্পর্কিত ঐ বিষয়গুলো ইনশাআল্লাহ্ বর্ণনা করবো। আল্লাহ্তাআলা যেন এর তওফীক দান করেন। কেননা, 'ওয়া মা তাশাউনা ইল্লা আই ইয়াশায়াল্লাহু রব্বুল আলামীন" - তোমরা কোন কিছুও চাইতে পার না কিন্তু যতোটুকু আল্লাহ্ চান, যেন তোমরা তা চাও। 'আস্ সালামু আলায়কুম ওয়া রহমতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু'।

অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্মুদ, সদর মুরব্বী

জুমুআর খুতবা

আহমদী শহীদগণের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের পাতা থেকে

[সৈয়্যদনা আমীরুল মুমিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত ৫ই মে, ১৯৯৯ মসজিদে ফযল, লন্ডন]

আহমদী শহীদগণ সম্পর্কে খুতবার উদ্দেশ্যে সূরা বাকারার ১৫৫ নং আয়াত পাঠ করেছি। প্রথমে খুতবা আরম্ভের সময় ধারণা ছিল না যে, এত বেশী মানুষ আহমদীয়তের খাতিরে শাহাদত বরণ করেছেন। স্নেহবর মির্যা গোলাম কাদেরের শাহাদতের ফলে শহীদগণের স্মরণ এবং আলোচনা আরম্ভ হওয়ার কারণে আশা করি আল্লাহ্‌র রহমত থেকে তিনি অংশ পাবেন। অনেক নাম স্মরণ ছিল না বা সচরাচর তাদের নাম আলোচনা চলছিল না। সুতরাং তাদের নাম স্মরণ করানোর প্রয়োজন ছিল। পাকিস্তানে অনেক নাম ছিল যাদের নাম স্মরণ করা হচ্ছিল না। তাদের মন চাচ্ছিল যে, আল্লাহ্‌র নামে তাদেরকে স্মরণ করা হোক। ফয়েয সাহেব খুব ভাল বলেছেন, (কবিতার ছন্দ)

"কফস্ উদাস হ্যায় ইয়ারো ছাওয়া ছে কুচ্ছতো কহো।
কেহিঁতো বাহ্‌রে খোদা যিক্‌রে ইয়ার চলে।"

অতএব, যারা আমার বন্ধু তারা তাদেরও বন্ধু, তাদেরও বন্ধু তাঁরা যাঁরা আহমদীয়তের খাতিরে শাহদত বরণ করেছেন। আজকের এই আলোচনার ফলে হয়ত তাঁরা আনন্দিত হতে পারেন। আরো অনেকে আনন্দিত হতে পারেন যাদের মধুর স্মৃতি চির অম্লান হয়ে আছে এবং এদ্বারা তারা বড় প্রশান্তি পেতে পারেন যে, কত বড় বড় মহৎ প্রাণরা কত বড় বড় ত্যাগ স্বীকার করে গত হয়ে গেছেন। তাদের বড় ত্যাগের কথা মনে পড়লে মনে হয় আজ যারা শহীদ হচ্ছেন তাদের বড় কোন ত্যাগই নেই। সুতরাং বিষয়টিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আফগানিস্তানে যা ধারণা করা হয় তার চেয়ে অনেক বেশী আহমদী শহীদ হয়েছেন।

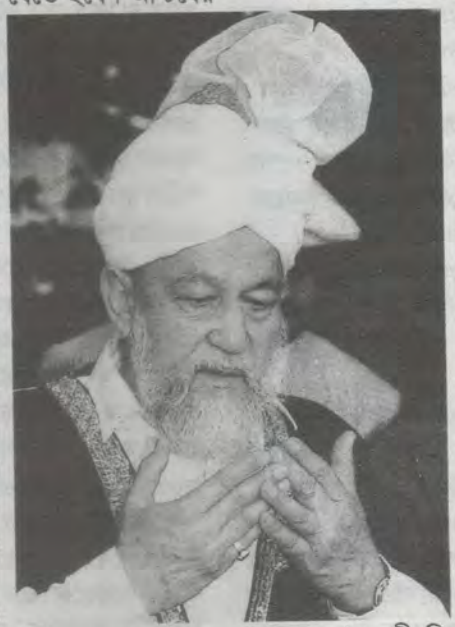

সর্বপ্রথম আমি সাহেবযাদা মুহাম্মদ সাঈদ জান ও সাহেবযাদা মুহাম্মদ ওমর জান আফগানিস্তানীদের কথা উল্লেখ করছি। ১৯১৭ ইং সনে গুজরাট জেলার ফযল করীম সাহেব নামে এক সংসার-ত্যাগী ব্যক্তি ছিলেন, যিনি তবলীগের বড় আগ্রহ রাখতেন। তিনি বড় সাহসী ছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন না যে, তার সাহসীকতার কারণে অন্যান্য আহমদীদের কী কী বিপদ হতে পারে। যাই হোক, তিনি ১৯১৭ ইং সনে তবলীগের উদ্দেশ্যে কাবুলে চলে যান। সেখানে গিয়ে সরদার নসরুল্লাহ্‌কে পত্র লিখে আবেদন করেন যে, 'আমি আহমদী এবং আমি তবলীগের উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি'। সরদার তৎক্ষণাৎই তাঁকে গ্রেফতার করে এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এখানে কে কে আহমদী আছেন। দরবেশ এবং সাধু প্রকৃতির এই ব্যক্তি যতজন আহমদীর নাম জানতেন তাদের নাম বলে দেন। তাঁর নিকট থেকে নাম পেয়ে সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ শহীদ (রাঃ)-এর পাঁচ পুত্রকে সরদার নসরুল্লাহ্ খান গ্রেফতার করে কারারুদ্ধ করে। তাঁরা তখনও আফগানিস্তানেই অবস্থানরত ছিলেন। তাঁদেরকে শেরপুরের কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়। তাঁদের পায়ে ভারী বড় মোটা বেড়ী পরিয়ে রাখা হয়েছিল। তাদের বাহ্যতঃ খুন করা হয় নি। কিন্তু কারাগারে কষ্ট দিতে দিতে এমন অবস্থা সৃষ্টি করা হয় যে, তাঁরা ঐ কষ্টের চোটে কারাগারেই মারা যান। এভাবে ধীরে ধীরে এবং বড় যন্ত্রণা ও কষ্ট পেতে পেতে মৃত্যু বরণ করেন। সাধারণতঃ খুন বা নিহত হয়ে শহীদ হওয়ার চেয়ে ইহা বড় মর্মান্তিক ও যন্ত্রণাদায়ক। ৮/৯ মাস পর্যন্ত তাঁরা জেলে কষ্ট পেতে থাকেন। খাবার জন্যে কেবল শুক্‌নো রুটী ও লবণ ব্যতীত কিছুই দেয়া হ'ত না। এতে তারা কষ্ট পেতে থাকলেন। শরীর নিঃশেষ হয়ে গেল। এভাবে একদিন তাঁরা মারা গেলেন। নিঃসন্দেহে তাঁরা শহীদগণের অন্তর্ভুক্ত। এমন করে দীর্ঘ দিন কষ্ট পেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরা অনেক বেশী মর্মান্তিক ঘটনা।

আরও দু'জন শহীদ উপরের বর্ণনার মতই আফগানিস্তানের কারাগারে শহীদ হন। এটা ১৯১৮ ইং সনের ঘটনা। হযরত সৈয়দ সুলতান আহমদ ও তাঁর ভাই সৈয়্যদ হাকীম সাহেবের ঘটনা। এদেরকেও শুক্‌নো রুটী ও লবণ ব্যতীত কিছু দেয়া হয় নি। দীর্ঘদিন কষ্ট পেয়ে পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি নষ্ট হয়ে শরীর নষ্ট হয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। জাজি অঞ্চলের শাসক সরদার মুহাম্মদ খাঁর আদেশে এদেরকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। হযরত সৈয়্যদ সুলতান আহমদ অনেক বড় আলেমে দীন ছিলেন। দীর্ঘদিন ঐ ধরনের খাদ্য গ্রহণ করার ফলে তাঁদের দেহের সবকিছু নষ্ট হয়ে অবশেষে শহীদ হয়ে গিয়েছেন। আমি ঐতিহাসিকভাবে সন তারিখের হিসেবে শহীদগণের নাম নোট করেছি। অতএব, তারিখ অনুযায়ী আম্বালা নিবাসী হাজী মীরা বক্‌শ সাহেব ও তাঁর স্ত্রীর শাহাদতের কথা বলছি। ১৩-১৪ আগষ্ট- ১৯৪০ ইং সনে তাঁরা উভয়ে শহীদ হয়েছেন। ১৩-১৪ আগষ্ট তারিখের মধ্য রাতে হযরত হাজী মীরা বক্‌শ (রাঃ) ও তাঁর স্ত্রীকে নিজ বাস গৃহে শহীদ করা হয়েছিল। হাজী মীরা বক্‌শ সাহেব কোরায়েশী মহল্লা আম্বালা শহরে চামড়া ব্যবসায়ী ছিলেন। হাজী সাহেব ১৯০৪ ইং সনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর হাতে বয়াত হয়েছিলেন। বড় উৎসাহী দায়ী ইলাল্লাহ্ ছিলেন। আল্লাহ্‌র ফযলে আহমদীয়তের কল্যাণে তাঁর ব্যবসা বড় লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছিল। ফলে আহমদী অগ্রগামী ব্যবসায়ী হিসেবে বড় প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

মৌলভীরা বড় হিংসায় জ্বলছিল এবং এদেরই ইশারায় ১৩-১৪ আগষ্ট রাতে যখন তিনি ও তাঁর স্ত্রী ঘুমোচ্ছিলেন তখন তাদের উপর আক্রমণ চালানো হয়েছিল। প্রথমে হাজী সাহেবের পাঁজরে ধারালো চাকু দিয়ে আক্রমণ করা হলে তিনি তখনই প্রাণ ত্যাগ করেন। আক্রমণের কারণে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। স্ত্রী চিৎকার করে দৌড়ে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে যেতে চাচ্ছিলেন। তারা আক্রমণ করে স্ত্রীকে সিঁড়ি থেকে টেনে নামিয়ে ফেলে চাকু মেরে শেষ করে দেয়। ঘটনার বীভৎসতা আরো মর্মান্তিক হয়ে যায় একথা জেনে যে, স্ত্রীর কোলে ১০ মাস বয়সের এক কন্যা শিশু ছিল। মা যখন আহত হয়ে পড়ে যায় তখন তার কন্যা মায়ের দেহের নীচে চাপা পড়ে যায় এবং মা মারা গেলে কন্যা মায়ের শরীরের নীচে চাপের মধ্যে পড়ে থাকে। যারা উদ্ধার করেন তারা দেখেন যে, কন্যা মায়ের দুধ চুষতে ছিল কিন্তু মা তো মারা গেছে তাই দুধ আসছিল না।

বড়ই হৃদয় বিদারক ঘটনা। পোষ্ট মর্টেম করার পর লাশও আহমদীদের দেয়া হয় নি। ফলে লাশ কাদিয়ানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। গয়ের আহমদী আত্মীয়রা স্থানীয়ভাবে দাফন করেছিল।

২৯ মে, ১৯৪২ ইং তারিখে সুবেদার খোশহাল খানকে শহীদ করা হয়। ছোয়াবী জেলা মরদানে ১৮৬৮ ইং সনে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তিনি। তার ভাই জমাদার সুলতান মুহাম্মদ খান সাহেব। সুবেদার খোশহাল খান সাহেবের শাহাদতের ঘটনা বলব। এখানে একথা উল্লেখযোগ্য যে, তাদের বংশের এই নিদর্শন আল্লাহ্‌প্রদর্শন করেছিলেন আহমদীয়তের কারণে। বংশ পরম্পরায় যতদূর স্মরণ আছে প্রায় ৩২ পুরুষ ধরে এমন হচ্ছিল যে, বংশে দু'টি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করত। দুই এর মধ্যে একজন নিঃসন্তান হোত তাদের দু'জনের একজন নিঃসন্তান মারা যেত। এভাবেই চলে আসছিল। কিন্তু তাঁর আহমদীয়ত গ্রহণের উপরোক্ত ধারাবাহিকতার মধ্যে আল্লাহ্ পরিবর্তন সাধন করলেন এবং তাঁর ঘরে একাধিক সন্তান-সন্ততি, নাতি-নাতনী হতে থাকল।

তিনি হয়ত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যুগেই কাযী মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের যেরে তবলীগ ছিলেন। কিন্তু তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর যুগে আহমদীয়ত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-কে স্বপ্নে দেখেছিলেন। তিনি বড় উৎকৃষ্ট মানের দায়ী ইলাল্লাহ্ ছিলেন। তাঁর শাহাদতের ঘটনা নিম্নরূপ ঃ গ্রাম মেনী, তহসীল ছোয়াবী, জেলা মরদানে তাঁর কঠোর বিরোধিতা হচ্ছিল। ২৯ মে, ১৯৪২ ইং তারিখে নিয়মমত ষ্টোপী জামাতে জুমুআর নামায আদায় করে গ্রামে ফেরৎ যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে গ্রামের নিকটে আড়াল থেকে অজ্ঞাত নামা কিছু লোক গুলি করে তাঁকে শহীদ করে। হত্যাকারী ঘটনাস্থলে একটি পত্রও রেখে যায়। তাতে লেখা ছিল যে, কাদিয়ানী ধর্ম পরিত্যাগ কর, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর ধর্ম নষ্ট করা থেকে বিরত থাক। নতুবা সারা পরিবার নিধন করে দেয়া হবে।

তিনি ৯ (নয়) জন পুত্র, তিন কন্যা ও অনেক নাতী-নাতনী রেখে যান। হতে পারে এই সন্তান বা নাতী-নাতনীর কেউ হয়ত আমার ভাষণ শুনছেন। যদি কেউ আমার কথা শুনেন তবে তিনি যেন তার বংশের বর্তমান অবস্থা আমাকে লিখে জানান। কে কোথায় কেমন আছেন আল্লাহ্‌র কি ধরনের ব্যবহার আপনারা উপভোগ করছেন।

এবার কিছুক্ষণের জন্যে হিন্দুস্তানের কথা ছেড়ে ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসের পাতায় নিয়ে যাচ্ছি। ইন্দোনেশিয়াতেও অনেক ধর্মপ্রাণ আহমদী শাহাদত বরণ করেছেন। আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে তাঁদের শাহাদতের ইতিহাসও সোনালী অক্ষরে লেখার মতো ইতিহাস।

যখন তারা কেবল মাত্র স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণার পর পর ১৯৪৫ ইং সনে চোকি কাউ এলাকা, নাসেক মালায়া জেলার পশ্চিম জাভা (ইন্দোনেশিয়ান) অঞ্চলে মাসুমী নামের এক উগ্রপন্থী মুসলিম সংগঠনের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে ৬ (ছয়) জন আহমদীকে শহীদ করা হয়েছিল। যাদের নাম মোহতরম সায়েরী সাহেব, মোহতরম শুরিয়া সাহেব, মোহতরম সায়েরী সাহেব, মোহতরম হাজী হাসান সাহেব, মোহতরম রাদেন সালেহ্, মোহতরম কাহ্‌লান সাহেব। এদের প্রত্যেককে বড় হৃদয় বিদারক উপায়ে অর্থাৎ হাত বেঁধে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে সকলের চোখের সামনে শহীদ করা হয় (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। একথা স্পষ্ট যে, ঐ সময় এদের সকলের জন্যে বড় সুযোগ ছিল তওবা করে অর্থাৎ আহমদীয়ত ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যাবার। কিন্তু বাস্তবে কেউ মুরতাদ হতে প্রস্তুত হন নি। বড় সাহসীকতার সাথে শাহাদত বরণ করেন। ঐ একই অঞ্চলে ঐ সময়েই সাংকিয়াং নামক গ্রামে ঐ একই সংগঠনের প্ররোচনায় হৃদয়হীনভাবে শহীদ করা হয়েছে চারজন অন্যান্য আহমদীকে। যাঁদের নাম মোহতরম হাজী সানোসী সাহেব, মোহতরম ওমো সাহেব, মোহতরম তাহিয়ান সাহেব, মোহতরম সাহরুমী সাহেব। ১৯৪১ ইং ১৯৪৫ইং ওয়ারিং দোং চিয়াংগোজ দুষ্ট প্রকৃতির মৌলভীদের প্ররোচনায় দুইজন আহমদীকে প্রথমে কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়। ২রা মে তারিখে মোহতরম মারতানী সাহেব জেলেই ইন্তেকাল করেন। এভাবে তিনি শাহাদত লাভ করেন। যদিও তাঁকে হত্যা করা হয় নি তবুও এভাবে জেলে যারা বন্দী অবস্থায় ইন্তেকাল করেন তাঁরাও শহীদ-ই হন।

এবার ইউরোপের ঘটনার আসছি। ইউরোপের প্রথম শহীদ আহমদীর কথা বলছি। মোহরতম শরীফ দোতছা আল্‌বেনীয়ার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পুত্র এখানে আমার সাথে সাক্ষাতও করেছেন। শরীফ দোতছা সাহেব ইউরোপের প্রথম আহমদী শহীদ ছিলেন। কারণ কমিউনিষ্ট বিপ্লবের সময় তারা ধর্মের নামও শুনতে প্রস্তুত ছিল না। আমাদের এই আহমদী বড় সাহসীকতার সাথে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কমিউনিষ্ট সরকারকে বলেছিলেন যে, তোমাদের এই কমিউনিজমকে আমি মানতে পারি না। ফলে তাঁকে শহীদ করা হয়েছিল অর্থাৎ তিনি মৃত্যুকে সম্ভ্রান্ত নেতা ছিলেন তার প্রভাব আল্‌বেনীয়ান এবং যুগোস্লাভাকীয়ানদের মধ্যেও ছিল। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) তার শাহাদতের ঘটনা সম্পর্কে লিখেছিলেন।

শরীফ দোতছা একজন নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। তাঁর অপরাধ কেবল এতটা ছিল যে, তিনি কমিউনিষ্ট সরকারের বিরোধী ছিলেন এবং ঐ দেশে যারা কমিউনিষ্ট বিরোধী ছিলেন তাদের তিনি লিডার ছিলেন। সকলেই মৃত্যুবরণ করেন। কেউ নির্ধারিত সময়ের বেশী জীবিত থাকতে পারে না কিন্তু সেই ব্যক্তি কল্যাণমন্ডিত যিনি কোন না কোনভাবে ধর্মের সেবায় মারা যান। শরীফ দোতছা এই গৌরবের অধিকারী যে, তিনি ইউরোপের প্রথম শহীদ হয়েছেন।

এবার পুনরায় সীমান্ত প্রদেশে যাচ্ছি। মোহতরম মুহাম্মদ আকরাম খান সাহেব চারসাদ্দা জেলা পেশাওয়ার ১০ ই জানুয়ারী, ১৯৫১ ইং তারিখে শহীদ হন। তিনি মৌলভী ইলিয়াস সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়ত গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমে পয়গামী ছিলেন পরে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর হাতে হাত রেখে বয়াত হয়েছিলেন। বড় নিষ্ঠাবান ছিলেন। তবলীগে বড় উৎসাহী ছিলেন। বই-পত্র পড়ার নেশা ছিল। কিছুকাল নায়েব তহশীলদার ছিলেন। প্রদেশের চীফ কমিশনারের অফিসে মুন্‌শীও ছিলেন। পরবর্তীতে কৃষি কাজ শুরু করেন এবং চারসাদ্দার নিকটে 'ডাবা' নামক একটি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। 'ডাবা'-তেই কেউ একজন বন্দুকের গুলি করে তাঁকে শহীদ করেছিল।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) বলেছিলেন, "তিনি ৭৬ বছর বয়স্ক আহমদী এবং সম্ভ্রান্ত বংশের ছিলেন। এই সেই আহমদী যার ভাই বলেছিলেন যে, আমরা এক আধুলী আহমদীদেরকে অপর আধুলী গয়ের আহমদীদেরকে দিয়ে দিয়েছি। প্রথমে গয়ের মুবাঈন (লাহোরী) পরে মুবাঈন হয়েছিলেন। অনুমান করা হয়েছে, মৌলভীদের ইশারায় তাঁকে শহীদ করা হয়েছে। খুব সম্ভব মৌলভীদেরই হাত ছিল কিন্তু হুযূর (রাঃ)-এর নিকট প্রমাণ না থাকায় তিনি বলেছিলেন, "অনুমান করা হয়"।

এবার চৌধুরী মুহাম্মদ হোসেন শহীদের কথা। ১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২ ইং তারিখের ঘটনা। এটা ঐ যুগের ঘটনা যখন আহরারী মৌলভীরা রাত দিন বক্তৃতা করে জনগণকে উত্তেজিত করছিল। এমন সময় চৌধুরী মুহাম্মদ হোসেন সাহেবকে কমবেট জেলা খায়েরপুরে ১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২ ইং তারিখে শহীদ করা হয়। সিন্ধু প্রদেশের বুযর্গ শহীদগণের

মধ্যে এই শহীদের নাম স্মরণ রাখা উচিত। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসেই হত্যাকারীকে গ্রেফতার করে নেয় । চৌধুরী সাহেবকে শীঘ্রই হাসপাতালে নেয়া হয় কিন্তু তিনি শহীদ হয়ে যান (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)।

সন তারিখের হিসেব অনুসারে আর একবার ইন্দোনেশীয়ান শহীদদের উল্লেখ করছি। চিয়ান ডামের শহীদগণকে (ইন্দোনেশীয়ান) ৪ মার্চ, ১৯৫৩ ইং সনে শহীদ করা হয় যারা পুরুষ মহিলা সহ ৬ (ছয়) জন ছিলেন। ১৯৫৩ ইং সনেই পশ্চিম জাভা ইন্দোনেশীয়াতেই এক উগ্রপন্থী গ্রুপের নাম 'দারুল ইসলাম' ছিল। তাদের ইমাম কার্তো সোয়ারিও ইন্দোনেশীয়াতে ইসলামী শরীয়তের মানদন্ড প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছিলেন। এই কার্তো সোয়েরিও আন্দোলনের লক্ষ্য-বস্তু ছিল এই যে, তিনি শরীয়তের শাসন কায়েম করবেন। তার 'দারুল ইসলাম' পার্টি নিজেকে 'তানতারে ইসলাম' বলে প্রচার করত। এদের দুবৃত্ত লোকেরা ৩রা মার্চ শনিবার, ১৯৫৩ ইং সন্ধ্যা ৭টায় আহমদীয়া জামাত চিয়ানডামের প্রেসিডেন্ট-এর বাড়ীতে চলে যায়। ঐ সময় জামাতের প্রেসিডেন্ট মোহতরম সোনা সাহেব (বয়স ৩৭ বৎসর) এবং তাঁর ছেলে জামাতের সহকারী সেক্রেটারী ও মোহাসেব, মোহতরম ওসুন সাহেব (বয়স ২১ বৎসর)। প্রেসিডেন্ট সোনা সাহেবের নিকটতম আত্মীয় মোহতরম সালমান সাহেব (বয়স ২৬ বৎসর) উপস্থিত ছিলেন। তানতারের কর্মীরা জোরপূর্বক বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং এদের সকলকে বাড়ীর বাইরের খোলা মাঠে নিয়ে গুলি করে শহীদ করে ফেলে (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)।

অতঃপর তানতারের কর্মীরা এই জঘন্য কার্যক্রম জারী রাখে। তারা মোহতরম জুংলী সাহেবের বাড়ী যায় এবং জোরপূর্বক বাড়ীতে প্রবেশ করে সেখানে মোহতরমা ইদত এবং উনিয়া সাহেবা ঘরে ছিলেন তারা এই তিনজনকেই গুলি করে শহীদ করে দেয় (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)।

এবার লাহোরে শহীদগণের কথা বলব। যারা "মার্শাল ল্য" জারী হওয়ার পূর্বে শহীদ হয়েছেন। হয়ত কারো কারো উল্লেখ আগেও হয়ে গেছে। কিন্তু এবার আমি "ফাসাদাতে পাঞ্জাবের তাহকীকাতি আদালতের (১৯৫৩ ইং) রিপোর্ট" (পাঞ্জাব দাঙ্গার তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট) থেকে সংগ্রহ তথ্য পড়ছি। যে দিন 'মার্শাল ল্য' জারী করা হয় ঐ দিনের অবস্থা এত বেশী খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে, "তাহকীকাতে আদালতের জজ জনাব জাষ্টীস মুনীর সাহেব লিখেছেন, 'ঐ দিনের অবস্থার কথা মনে হলে সিনথ বার্থোলোনা ডে' স্মরণ হয়ে যায়। এই 'মার্শাল ল্য' এর পূর্বে যারা শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে স্কুল মাষ্টার মনজুর আহমদ সাহেবও ছিলেন। এই সকল শহীদ সম্পর্কে আমি বিস্তারিত বিবরণ জানাতে বলেছি যে, এরা কে কোথায় কী অবস্থায় ছিলেন খোঁজ-খবর নিয়ে জানাবেন। শাহাদতের ইতিহাস লিখতে গিয়ে কেবল এতটা খেয়াল রাখা হয়েছে যে, কে কে শহীদ হয়েছেন। অথচ এটাও খোঁজ করা উচিত ছিল যে, কে কোথায় কীভাবে শহীদ হলেন, পরে তাদের পরিবারের কে কোথায় গেলেন। আল্লাহ্ তাদের সাথে কি ধরনের আচরণ করেছেন। এখন খোঁজ করা হচ্ছে। এভাবে আল্লাহ্র ইচ্ছায় শাহাদ্তের সুমিষ্ট ফল হাসিল হবে। ঐ শহীদগণের, যাদের সন্তানদের ভুলে যাওয়া হয়েছিল এরপর আর তাদের ভুলে যাওয়া সম্ভব হবে না। খুতবায় এই ধারাবাহিকতায় ইনশাল্লাহ্ তাদেরও উল্লেখ করব।

মাস্টার মনজুর আহমদ শিক্ষক ছিলেন। কেবল এতটুকুই লেখা হয়েছে। আর কিছুই লেখা হয় নি। কে ছিলেন, কোথায় ছিলেন এসব কিছু লেখা হয় নি।

তারপর ৬ মার্চ মুহাম্মদ শফি বর্মাওয়ালা নামে এক আহমদীকে মোঘল পুরাতে শহীদ করা হয়েছে। আর এক আহমদী মিয়া জামাল আহমদ (ছাত্র)-কেও শহীদ করা হয়, ঐ একই দিনে।

মিয়া জামাল আহমদ (ছাত্র) শহীদের ঘটনা বড়ই বেদনাদায়ক এবং এতে তাঁর সাহসিকতারও প্রমাণ মেলে। বড় নির্ভিক ব্যক্তি ছিলেন। মিয়া জামাল আহমদ পিতা নযর মুহাম্মদ হালকা ভাটীগেল, লাহোর-কে ৬ মার্চ, ১৯৫৩ ইং তারিখে শহীদ করা হয়। শাহাদতের সময়ে তিনি তা'লীমুল ইসলাম কলেজ লাহোরে এইচ, এস, সি-এ ছাত্র ছিলেন। যখনই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী(রাঃ) লাহোর যেতেন, মরহুম শহীদ সারারাত ডিউটি দিতেন। ৫ মার্চ, ১৯৫৩ ইং সারারাত প্রহরায় ছিলেন। ৬ই মার্চ শুক্রবার। পিতা মাতাকে দেখতে তিনি সাইকেল যোগে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় রাস্তায় মানুষ মিছিল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই যুবক যখন সেখান দিয়ে অতিক্রম করছিলেন তখন মিসিল থেকে তার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। তিনি সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়িয়ে গেলেন। ভীড় থেকে মানুষ তাঁকে গালি দিতে দিতে তাঁর দিতে এগিয়ে আসল এবং বলতে থাকল এই যুবক কাদিয়ানী একে মেরে ফেল। একব্যক্তি তাঁর ব্যক্তি পরিচয়ের কারণে নিকটে এসে বল্লেন, জামাল ! তুমি বলে দাও, 'আমি আহমদী নই'। আমি তোমাকে বাঁচাবো। তুমি জোড় গলায় না বল্লেও আমার কানে কানে বলো আমি সকলকে বাঁধা দিব"। কিন্তু জামাল সাহেব বল্লেন, আমি আল্লাহ্র ফযলে আহমদী, প্রাণে বাঁচার তাগিদে মিথ্যা বলব না। তোমরা যা করার কর। ভীড়ের জনতা তাকে ফেলে দিয়ে চাকু মেরে শহীদ করে দিল (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। শাহাদত বরণের সময় তাঁর বয়স মাত্র ১৭ বছর ছিল। জামাল আহমদ শহীদের ভাই নাসির উদ্দিন বেলাল লিখেছেন, শহীদের হত্যাকারীকে সরকার ধরে রেখেও পরে ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন। একজন তাদের মধ্যে পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াত। ময়লা ড্রেনের মধ্যে পড়ে ময়লা খেত। এভাবেই সে মারা যায়। অপরজন অন্ধ হয়ে মরে যায়।

আর একজন আহমদী মির্যা করীম বেগ সাহেবকে এক রাজপথে ছুরি মেরে শহীদ করা হয়। তারপর তাঁর লাশকে এক অগ্নিকুন্ডে ফেলে দেয়া হয়, যে অগ্নিকুন্ড কাঠের আসবাব পত্রে আগুন লাগিয়ে জ্বালানো হয়েছিল। অগণিত আহমদীর সম্পদ লুট করে নেয়া হয়েছিল সেই দিন। এদের দোকানও মালপত্রে আগুন লাগানো হয়েছিল। দুপুরের পরে একজন বিশিষ্ট আহমদী শেখ বশীর আহমদ সাহেব এ্যডভোকেটের বাড়ী ঘিরে ফেলা হয়। এখানে কেউ শহীদ হয় নি। কিন্তু জনাব শেখ বশীর আহমদ নিরাপত্তার খাতিরে গুলি চালিয়েছিলেন। তাই তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে আদালত তাঁকে মুক্তি দেয়।

৭ই মার্চ রাতে আব্দুল হাকিম যিনি "পাইয়োনিয়ার ইলেকট্রিক এন্ড ব্যাটারী ষ্টেশনারীর' মালিক ছিলেন। তাঁর ঘরে আক্রমণ করে তাঁর বৃদ্ধা মাকে হত্যা করা হয় অথচ মা আহমদী ছিলেন না। এই দুর্ঘটনা এজন্যে ঘটেছিল যে, আব্দুল হাকীম সাহেব গঞ্জ মুঘলপুরা জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অতএব, শত্রুরা মাকে আহমদী মনে করে হত্যা করেছিল।

৮ই মার্চ, ১৯৫৩ ইং তারিখে লাহোরে আরো দু'জন শহীদ হন। একজন জনাব হাবিলদার আব্দুল গফুর সাহেব পিতা এলাহী বক্শ সাহেব। দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি শহীদ হন তিনি একজন আতর প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা ছিলেন। কোন কারণে তার নাম লেখা নেই। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, কোন না কোন কারণে ইতিহাসে তাঁর নাম উল্লেখ করা সম্ভব হয় না। অথচ এটা সম্ভব বলে মনে হয় না যে, একজন আহমদী শহীদ হয়েছেন,

তার নাম-ধাম কিছুই পাওয়া যায় নি। তাঁর আত্মীয়-স্বজন কি কেউ কোথাও ছিল না যাদের নিকট জরুরী তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হতো। পরবর্তীতে তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা কোথায় কোথায় বসবাস করেন এসব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা একান্তই আবশ্যক ছিল। হয়ত ঐ সময় ফ্যাসাদের আশংকায় তাৎক্ষণিকভাবে নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি কিন্তু ফ্যাসাদের পরে তো সংগ্রহ করা মোটেই অসম্ভব ছিল না।

এবার কাদিয়ানের হেফাযতের কারণে আশ-পাশে যে সব শাহাদতের ঘটনা ঘটেছিল তার উল্লেখ করব। কিন্তু বিষয়টি একটি ইতিহাসের বিরাট বড় অধ্যায়। অনেকগুলো দিক আলোচনার যোগ্য। অতএব, এই মুহূর্তে কেবল এতটুকু আলোচনা করব যে, হিজরতের পূর্বে (কাদিয়ান থেকে রাবওয়ায় হিজরত) সেখানে যে অবস্থা বিরাজ করছিল সেখানে যারা ইন্তেকাল করেছেন ঐ অবস্থায় তাদেরকে শহীদ বলে আখ্যায়িত করা জায়েয হবে। যদিও দেশ ভাগাভাগীর বিষয়টা একটি রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল (১৯৪৭ ইং পাকিস্তান-ভারত দ্বন্দ্ব)। যার ফলে আক্রমণ হচ্ছিল। কিন্তু তবুও প্রকৃত সত্য এই যে, লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে পাঞ্জাবে শহীদ করা হয়েছিল তাঁদের হত্যা করার একমাত্র কারণ ছিল যে, তারা মুসলমান। সুতরাং তারা আহমদী ছিলেন বা আহমদী ছিলেন না, তাদের হত্যা করার একমাত্র কারণ এই ছিল যে, তারা মুসলমান ছিলেন। সুতরাং যাকে মুসলিম হবার কারণে হত্যা করা হয়েছে সে যে প্রকারেরই মুসলমান হোক না কেন, পাকা মুসলমান বা নামে মাত্র মুসলমান যেমনই হোক তিনি শহীদের মর্যাদা পাবেন।

এখানে যেসব আহমদী মুসলমান শহীদদের কথা উল্লেখ করব তাঁদের সম্পর্কে একথা আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, এদের অনেকেই অন্য অনেক শহীদের তুলনায় বেশী বড় মর্যাদার শহীদ ছিলেন। অনেক আহমদী যুবক মুসলমান ভাইদের প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন। কাদিয়ানে বড় দূর-দূরান্ত থেকে অনেকে এসে একত্রিত হয়েছিলেন। যেন তারা অন্যদের প্রাণ বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্ট করে, নিজেদের কেন্দ্র রক্ষার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। সুতরাং এমন আহমদী মুসলিমের প্রাণ বিসর্জন স্পষ্টই শাহাদতের মর্যাদা রাখে। তারা মৃত্যুর সাথে চোখে চোখ রেখে সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছেন। তারা জানতেন যে, অবস্থা অভাবনীয় এবং মর্মস্পর্শী তথাপিও তাঁরা দূর-দূর গ্রামে গিয়ে মাত্র কয়েকজন যুবক সমস্ত গ্রামের মুসলিম জন বসতিকে গ্রাম থেকে বের করে দিচ্ছিলেন। তারা সংখ্যায় মাত্র কয়েকজন করে হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করেছিলেন। তারা অনেক বড় সংখ্যায় মুসলিম জনতাকে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করার সুযোগ পান। কুরবানীর অবস্থা এই ছিল যে, খাবার জন্যে রুটিও দুর্লভ ছিল। ঐ অবস্থায় এক লক্ষের অধিক সংখ্যক মুসলমান জনগণকে রুটি দেবার ব্যবস্থা কাদিয়ানের লংগর খানায় করা হয়েছিল। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর দূরদর্শিতা দেখুন ! ফ্যাসাদ আরম্ভের বহু পূর্বে তিনি অনুমান করেছিলেন যে, অবস্থা খারাপ হলে কোন স্থান থেকে গম সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। তাই তিনি আহমদী জামাতের ব্যবস্থাপনাকে কাজে লাগিয়ে প্রচুর গম সংগ্রহ করে রেখেছিলেন বহু পূর্বেই। দূর-দূর অঞ্চলে লোক পাঠিয়ে গম ক্রয় করে এনে জমা করেছিলেন। তখন সাধারণ মানুষ আশ্চর্য হচ্ছিলেন যে, এতটা গমের কী প্রয়োজন ? কিন্তু যখন অবস্থা খারাপ হয়ে গেল এবং লক্ষ লক্ষ মুসলমান কাদিয়ানে এসে আশ্রয় নিতে আরম্ভ করল তখন বুঝা গেল যে, ব্যাপার কী ! যদি পূর্বেই গম জমা করে রাখা না হতো তবে ঐ লক্ষ লক্ষ মুসলমান এখানে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে যেত। আল্লাহ্‌র ফযলে কাদিয়ানে জমা করা গমে এতবড় জনতাকে কমপক্ষে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দিয়েছিল। হয়ত অনেকে কেবল মাত্র রুটি ও পানি খেয়ে বেঁচেছে। তরকারী অনেক সময় দেয়া সম্ভব হয় নি। কিন্তু প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। শত শত আহমদী যুবক ঐ সময় কাদিয়ানে এসে খেদমত করেছিলেন। আল্লাহ্ সবাইকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

তার পরের বিষয় যেহেতু সুদীর্ঘ এবং সময় অল্প রয়েছে সুতরাং পরবর্তী বিষয় পরবর্তী খুতবাসমূহে প্রবহমান থাকবে, ইনশাল্লাহ্। আল্লাহ্‌তাআলা ঐ সব সেবকগণকে ইহকাল ও পরকালে পুরস্কার তো দিয়েই দিয়েছেন এখন এদের প্রদর্শিত সুপথে চলার জন্যে বর্তমান প্রজন্মকে শক্তি দান করুন।

অনুবাদ- **মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী**
সদর মুরব্বী

উটেচড়া নবী চাঁদেচড়া মানুষ

(৩০তম কিস্তি)

ওহুদের যুদ্ধ

বদরের যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে যাওয়ার সময় কুরাইশরা ঘোষণা দিয়ে গেলো যে, আগামী বছর তারা এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পুনরায় মদীনা আক্রমণ করবে। যুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতির জন্যে তারা অর্থসংগ্রহের সাথে সাথে অস্ত্র-শস্ত্র ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে থাকে। কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের মাঝে যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টির জন্যে আমর জামহী ও মুসহাক নামক দু'জন প্রসিদ্ধ কবিকে দায়িত্ব দেয়া হয়।

যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে তিন সহস্রাধিক সৈন্যের বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণ করতে আসে কুরাইশরা। তারিখটি ছিলো ৫ ই শওয়াল, তৃতীয় হিজরী, বুধবার। ওহুদ পাহাড়ের পাদদেশে তারা তাবু ফেলে।

আঁ হযরত (সঃ) সাহাবাগণের কাছে পরামর্শ চাইলেন, 'আমাদের কি শহরের ভিতর থেকে যুদ্ধ করা উচিত, না বাইরে গিয়ে' ? হুযূর (সঃ)-এর ব্যক্তিগত অভিমত ছিল যে, শত্রুকে আগে আক্রমণ করতে দেয়া উচিত। এতে যুদ্ধ বাধানোর দায়-দায়িত্ব তাদের উপরে বর্তাবে। তা'ছাড়া মুসলমানরা ঘর থেকে সহজেই ওদেরকে প্রতিহত করতে পারবে। নওজোয়ান মুসলমান যারা বদর যুদ্ধে অংশ নিতে পারে নি তারা ওহুদে যেয়ে যুদ্ধ করতে বিশেষ জোর দেয়। পরামর্শ নেয়ার সময় হুযূর (সঃ) একটি স্বপ্নের বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি বল্লেন, স্বপ্নে আমি একটি গাভী দেখলাম। দেখলাম যে, আমার তরবারির ডগা ভেঙ্গে গেছে। আমি আরও দেখলাম, ঐ গাভীটিকে যবাই করা হচ্ছে। আবারও দেখলাম যে, আমি আমার হাত একটা শক্ত ও সুনির্মিত বর্মের ভেতরে ঢুকায়ে দিয়েছি (ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড)। আমি আরও দেখলাম যে, আমি একটি মেষের উপরের সওয়ার হয়েছি (তাবাকাত ইবনে সা'দ প্রথম কিসম, জুয ২য়)। সাহাবারা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনার এই প্রশ্নের তা'বীর (ব্যাখ্যা) কী ? তিনি (সঃ) বল্লেন, গাভী যবাই করার অর্থ হচ্ছে, আমার কোন কোন সাহাবী শহীদ হবেন। তরবারীর আগা ভেঙ্গে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, আমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্য থেকে কোন এক বড় ব্যক্তি শহীদ হয়ে যাবেন, অথবা আমি নিজেই কোন কষ্ট পাবো। এবং বর্মের মধ্যে হাত ঢোকানোর তা'বীর, আমার মনে হচ্ছে, মদীনার ভিতর থেকে যুদ্ধ করাই আমাদের জন্যে সুবিধাজনক হবে। এবং মেষের উপর সওয়ার হওয়ার তা'বীর মনে হচ্ছে কাফেরদের সেনাবাহিনীর কমান্ডারের উপরে আমরা বিজয় লাভ করবো। অথবা সে মুসলমানদের হাতে মারা যাবে'।

যা হোক তিনি অধিকাংশের মতকেই গ্রহণ করে যুদ্ধের জন্যে মদীনার বাইরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। যখন তারা শহরের বাইরে এলেন তখন নওজোয়ানরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে বল্লো, ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! আপনার পরামর্শই সঠিক। আমাদের উচিত মদীনার ভিতরে থেকে যুদ্ধ করা। আঁ হযরত (সঃ) বল্লেন, 'আল্লাহ্‌র নবী যখন বর্ম পরিধান করে, তখন তা আর খুলে ফেলে না। এখন যা-ই হোক না কেন আমরা অগ্রসর হবো। তবে, তোমরা ধৈর্য সহকারে কাজ করো, তাহলে আমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র সাহায্য পাবো।'

হুযূর (সঃ) এক হাজার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে কতদূর গিয়ে রাত কাটানোর জন্যে শিবির স্থাপন করলেন। ফজরের নামাযের সময় হুযূর (সঃ) বাইরে আসেন এবং দেখতে পান যে, কিছু সংখ্যক ইহুদী কবিলা তাদের সাথে চুক্তি করার উছিলায় এ যুদ্ধে সাহায্য করার জন্যে এসেছে। তাদের চক্রান্তকারী স্বভাব সম্পর্কে হুযূর (সঃ) ওয়াকেফহাল থাকায় তাদেরকে তিনি ফেরৎ যেতে বল্লেন। তাতে মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ্ বিন উবায় বিন সলুল তার তিনশ' সৈন্যের দল সহ এই বলে, এখন এটাতো কোন যুদ্ধ হবে না, হবে ধ্বংসের মুখে নিজেদেরকে নিক্ষেপ করা। কেননা, নিজেদের সাহায্যকারীদেরকে যুদ্ধ থেকে বাদ দেয়া হলো। ফল এই হলো যে, মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়ালো মাত্র সাতশ'তে যা সংখ্যার দিক থেকে কাফেরদের সৈন্য সংখ্যার এক চতুর্থাংশেরও কম। এবং যুদ্ধ-সামগ্রীও আরো কমে গেলো। কেননা, কাফেরদের বর্মধারী সৈন্যের সংখ্যা ছিল সাতশ'। পক্ষান্তরে, মুসলমানদের বর্মধারী সৈন্যের সংখ্যা মাত্র একশ'। এছাড়া কাফেরদের ছিল দু'শত ঘোড়-সওয়ার। অপরদিকে, মুসলমানদের ছিল মাত্র দু'টো ঘোড়া।

এমন অবস্থায় যে বিষয়টি বিশেষভাবে উপলব্ধির দাবী রাখে তা হলো নবী-রসূলগণ সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও নির্দেশ দ্বারা পরিচালিত হন। তা'ছাড়া কোন কোন আদর্শের জন্যে মুনাফিক থাকার চেয়ে না থাকা অনেক ভাল।

যাহোক আঁ হযরত (সঃ) তাঁর বাহিনী নিয়ে ওহুদে এসে পৌছুলেন এবং পাহাড় পশ্চাতে রেখে সৈন্য সমাবেশ করলেন। পাহাড়ে একটি গিরিপথ ছিলো। অতর্কিতে সে পথে শত্রু সৈন্যেরা আক্রমণ করে বিপর্যয় ঘটাতে না পারে সেজন্যে আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইয়ের অধীনে ৫০ জন বাছাই করা লোক নিয়োগ করলেন। তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, আমাদের পশ্চাৎ ভাগ রক্ষা করবে আর এখান থেকে নড়বে না; যদি দেখো আমরা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করছি আর মালামাত্তা লুটে নিচ্ছি তাতে তোমরা আমাদের সঙ্গ দেবে না, আর যদি ওরা আমাদের পেছনে ধাওয়া করে আর আমরা হেরে যাই তবু আমাদের সাহায্যের জন্যে তোমরা এগোবে না। এরপর হযরত পরিধান করলেন আরো একাট বর্ম আর পতাকা দিলেন বিখ্যাত ইসলাম প্রচারক মুসআব বিন ওমায়েরের হাতে [হযরত মুহাম্মদ ও ইসলাম পুস্তক লেখক কাজী আব্দুল ওদুদ] হুযূর (সঃ)-এর উপরোক্ত নির্দেশাবলী যে কতো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলো তা বলে শেষ করা যাবে না। বস্তুতঃ এ গিরিবর্তটিই ছিলো ওহুদ যুদ্ধের চাবিকাঠি। হুযূর (সঃ) দুনিয়াবী দৃষ্টিতে কোন যুদ্ধ বিশারদ না হয়েও কত নিখুঁতভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন তা ভাবতেও অবাক লাগে। নবীর পক্ষেই তা সম্ভব।

উল্লেখ্য যে, আবূ আমের মদীনার পুরোহিত ছিল। সে হুযূর (সঃ)-এর মদীনায় হিজরতের পর মক্কায় চলে যায়। তার ধারণা ছিল যে, সে আহ্বান জানালে আনসারগণ তার দলে চলে আসবেন। এ উদ্দেশ্যে পরদিন যুদ্ধের আগে আবূ আমের আনসারদের আহ্বান জানায়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। কেউই এতে সাড়া দেন নি।

যুদ্ধ শুরু হলো। যুদ্ধের তৎকালীন রীতি অনুযায়ী কুরাইশ পক্ষ হতে তালহা দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে এগিয়ে এলো ও হযরত আলী (সঃ)-এর হাতে নিহত হলো। তালহার পুত্র হামযা অগ্রসর হলে মহাবীর হযরত হামযা (রাঃ)-এর হাতে সে প্রাণ হারায়। এরপর সাধারণ যুদ্ধ শুরু হলো। কুরাইশ বাহিনী মুসলমানদের আক্রমণ করলো। তুমুল যুদ্ধে কুরাইশ পতাকা ভূলুণ্ঠিত হলো। তাদের ১২ জন পতাকাবাহী সবাই প্রাণ হারালো। হযরত আলী, হযরত আমীর হামযা, হযরত আবূ দার্জালা প্রমুখ (রাঃ) বীরগণের আক্রমণে কুরাইশ বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো। যুদ্ধ উন্মাদনা সৃষ্টির জন্যে তাদের সাথে আগত মহিলারাও পালাতে থাকে। মুসলমান সৈন্যগণ কুরাইশদের পরিত্যক্ত মালামাল সংগ্রহ করতে থাকে। এতে মুসলিম বাহিনীতে বিশৃংখলা দেখা দিলো।

বিজয় পরাজয়ের রূপ নিলো

ইতোমধ্যে খালেদ বিন ওলীদ তার সৈন্যদের নিয়ে গিরিপথ দখলের চেষ্টা করে আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়রের তীরন্দাজদের কাছে পরাভূত হয়। কিন্তু ময়দানে মুসলমান সৈন্যেরা পলায়নপর কুরাইশদের মাল সংগ্রহ করছে দেখে গিরিপথ পাহারারত প্রায় সবাই যুদ্ধ শেষ হয়েছে মনে করে নিজেদের স্থান ত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্রে অন্যান্য সৈন্যদের সাথে পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহে যোগ দিলেন। উল্লেখ্য যে, কমান্ডার তাদেরকে নিজেদের স্থান ছেড়ে যেতে বারণ করেন এবং আঁ হযরত (সঃ)-এর নির্দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। সৈন্যেরা যুক্তি দেখালো হুযূর (সঃ) যা বলেছিলেন, তা শুধু কথায় জোর দেয়ার জন্যেই বলেছিলেন। তাঁর কথার অর্থ এই ছিল না যে, শত্রু পালাতে থাকবে আর তোমরা সব ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে। খালেদ বিন ওয়ালিদ [যিনি ইসলাম গ্রহণের পর একজন সুদক্ষ জেনারেল হিসেবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন]-এর দৃষ্টি পড়লো এদিকে। কুরাইশদের অপর একজন জেনারেল আমর ইবনুল আসকে সাথে নিয়ে মুসলিম সৈন্যদের পাশ কাটিয়ে পাহাড় পর্যন্ত পৌছে গেলো। যে কারণে মুসলিম সৈন্য গিরিপথ রক্ষার জন্যে সেখান ছিলেন তাদেরকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে এবং পিছন থেকে আচমকা মুসলিম সৈন্যদের উপর আক্রমণ করে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিলো। তাদের বিজয়সূচক শ্লোগানে উদ্বুদ্ধ হয়ে পলায়নপর সৈন্যরাও আবার যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হলো। অপরদিকে মুসলিম সৈন্যেরা বিচ্ছিন্নভাবে একেকজন একেক স্থান থেকে যুদ্ধ করছিলেন। অনেকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। জনা ত্রিশেক সাহাবী আঁ হযরত (সঃ)-এর কাছে সমবেত হলেন।

কুরাইশরা এই অবস্থায় দলবদ্ধ হয়ে হুযূর (সঃ)-কে আক্রমণের সর্বাত্মক প্রয়াশ চালায়। এ পরিবেশেও আল্লাহ্‌র রসূল অবিচল রইলেন। হযরত আবূ বকর, ওমর, আলী, আবূ দর্জালা, আবূ তালহা, যিয়াদ প্রমুখ সাহাবাগণ (রাঃ) আঁ হযরত (সঃ)-কে ঘিরে রেখে শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকেন। হযরত (সঃ) আক্রান্ত হওয়ার খবর পেয়ে বিবি উম্মে আম্মারা (রাঃ) যুদ্ধ ক্ষেত্রের সেবা কাজ পরিত্যাগ করে তাঁকে রক্ষার জন্যে অস্ত্র হাতে নেন। এ সম্পর্কে হযরত (সঃ) বলেছেন, 'সেই বিপদের সময় আমি দক্ষিণে, বামে যেদিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেদিকেই দেখি উম্মে আম্মারা (রাঃ) আমাকে রক্ষা করার জন্যে যুদ্ধ করিতেছেন'। অপরদিকে হিন্দা ও তার সাথীরা নিহত মুসলমানদের নাক কান কেটে মালা তৈরী করে গলায় পরে অলংকারের সাধ মিটাচ্ছিলো। হীনতার নিম্নতম স্তরে না গেলে মৃতদের সাথে কেউ এরূপ জঘন্য আচরণ করতে পারে ভাবা যায় না।

কুরাইশ সৈন্যদের অস্ত্রাঘাতে হুযূর (সঃ)-এর চারটি দাঁত পড়ে যায়। ইবনে কাদিয়ার তরবারির আঘাতে হুযূর (সঃ)-এর শিরস্ত্রাণ কেটে যায় ও এর দু'টো কড়া কপালে বসেঁ যায়। তাতে প্রচুর রক্তপাত হতে

থাকে। পরে হযরত ফাতেমা (রাঃ) পিতার রক্ত ধৌত করে চাটাই পুড়িয়ে এর ছাই দিয়ে রক্তপাত বন্ধ করেন। এরূপ অবস্থাতেও মহানবী (সঃ) বলেছিলেন, 'হে আমার প্রভু ! আমার কওমকে ক্ষমা করো, কারণ তারা অজ্ঞ।' কি অতুলনীয় মানবতাবোধ ! যা কখনও স্থান কালে আবদ্ধ থাকতে পারে না।

কুরাইশদের আক্রমণ প্রতিহত করা ও এর তীব্রতা হ্রাস হওয়ার পর বিশিষ্ট সাহাবীগণ হুযূর (সঃ)-কে নিয়ে ওহুদ পাহাড়ের উপর চলে যান। শত্রুরা সেখানেও আক্রমণের চেষ্টা করে। কিন্তু উপর হতে পাথর নিক্ষেপ করে এ প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে।

এ যুদ্ধে মুসলমানরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছে ভেবে আবূ সুফিয়ান যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করে। এ যুদ্ধে কুরাইশ বাহিনী তাদের অনেক বীর ও কয়েকশত সৈন্য হারায়। তবে যাবার সময় সে বলে যায়, 'আজ বদরের প্রতিশোধ। সৈন্যেরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের নাক কান কেটে নিয়েছে, আমি অবশ্য আদেশ দেই নি। তবে তা শুনে আমার দুঃখও হয় নি'। মৃতের প্রতি কি বীরত্ব প্রকাশ !

কুরাইশরা যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করলে হুযূর (সঃ)-এর নির্দেশে প্রথমে নিহত শহীদদের দাফন করা হয়। যুদ্ধের সাজে সজ্জিত অবস্থায়ই এক এক কবরে একাধিক শহীদকে দাফন করা হয়। তৎপর সকলে মদীনায় ফিরে যান।

আবূ সুফিয়ান সসৈন্যে মক্কার পথে যাত্রা করে। কিছু দূর যাওয়ার পরে মনে হলো মুহাম্মদ (সঃ) এখনও জীবিত। সুতরাং বড় কাজতো রয়েই গেলো। এ কাজ সমাধার জন্যে মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওহা নামক স্থানে রাত্রি যাপন করে। পরদিন সেখান থেকে মদীনায় রওয়ানা হয়। আবূ সুফিয়ান মদীনা আক্রমণ করতে পারে সে আশংকায় হুযূর (সঃ) পাহারার ব্যবস্থা করেন। পরদিন তিনি কুরাইশদের আক্রমণ করতে যাত্রা করেন।

ওদিকে পথিমধ্যে আবূ সুফিয়ানের সাথে খোজাআ গোত্রের মাবাদ খাযায়ীর সাক্ষাৎ হয়। তিনি আবূ সুফিয়ানকে বলেন ঃ আমি দেখে এসেছি, মুহাম্মদ (সঃ) এখন সাজ-সজ্জা করে আসছেন যে, এখন তাঁকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব। একথা শুনে আবূ সুফিয়ান ওখান থেকেই মক্কা ফিরে যায়।

আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত রাখতে গিয়ে অনেক বিষয় বাদ পড়েছে তবে কিছু কথা না বল্লে ইসলামের দিক থেকে ওহুদ যুদ্ধের গুরুত্ব পূরাপুরি অনুধাবন করা দুরূহ হয়ে পড়তে পারে। মুসলমানদের নিশ্চিত বিজয় বিপর্যস্ত হওয়ার মূল কারণ হলো ওহুদের গিরিপথ পাহারারত অধিকাংশ সৈন্যের পক্ষে নবী করীম (সঃ)-এর নির্দেশের মাঝে অযথা নিজস্ব তাৎপর্য আরোপ করে ঐ স্থান ত্যাগ করা। তারা মালামাল পাওয়ার মোহে পড়ে যান।

অনেক সাহাবাই নিজেদের জীবনের চেয়ে হযরত (সঃ)-এর জীবনকে অনেক বেশী গুরুত্ব এবং তাঁর আদেশ পালনকে সর্বাধিক মর্যাদা দিতেন। বস্তুতঃ তাঁরাই ছিলেন সঠিক পথের যাত্রী। উল্লেখ্য যে, ওহুদের যুদ্ধে এ-ও প্রমাণিত হয়েছে যে, হুযূর (সঃ) নিজের জীবনের চেয়েও অনেক অনেক বেশী মূল্য দিতেন আল্লাহ্‌র মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখাকে। তাই দেখা যায় যখন কুরাইশরা এক এক করে আঁ হযরত (সঃ) ও বিশিষ্ট সাহাবাগণের নাম নিয়ে হুংকার দিচ্ছিল তখন হুযূর (সঃ) সবাইকে চুপ থাকতে বলেন। কিন্তু যখন তারা তাদের জাতীয় শ্লোগান 'উলু হোবল উলু হোবল' আমাদের সম্মানিত দেবতা হোবলের মর্যাদা বুলন্দ হোক ! তিনি আজ ইসলামকে শেষ করে দিয়েছেন'। এই শিরিকি শ্লোগানে যখন এক আল্লাহ্‌র ইজ্জতের প্রশ্ন দেখা দিলো তখন হুযূর (সঃ) বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি দারুণ উত্তেজনায় সাহাবাদের বল্লেন 'তোমরা সবাই জওয়াব দিচ্ছ না কেন ? তিনি বল্লেন, বলো,

আল্লাহো 'আলা ওয়া আজাল্লো

আল্লাহো 'আলা ওয়া আজাল্লো" (আস্ সিরাতুল হালবিয়া ঃ ২য় খন্ড)। অর্থাৎ 'তোমরা মিথ্যা বলছ যে, হোবলের মর্যাদা উচ্চ হয়েছে, বরং যে আল্লাহ্ এক ও অংশীদারবিহীন তাঁর মর্যাদাই সর্বোচ্চ'।

ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের স্পষ্ট বিজয় লাভের পর বিপর্যয় ঘটে। এর মাঝে মু'মিনদের জন্যে শিক্ষণীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। এ যেন বাস্তবমুখী প্র্যাক্‌টিকেল ক্লাস করার মত। দ্বিতীয়তঃ এই যুদ্ধে রসূল করীম (সঃ)-এর সত্যতার এক বড় নিদর্শন ছিলো। কেননা, এতে হুযূর (সঃ)-এর বেশ কিছু ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রথমে মুসলমানেরা বিজয় লাভ করেন ও পরে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। হযরত হামযা (রাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারেই শাহাদত লাভ করেন। ভবিষ্যদ্বাণী মতই যুদ্ধের শুরুর দিকেই কাফেরদের এক বড় নেতা নিহত হয়। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হুযূর (সঃ) আহত হন, কিছু সংখ্যক সাহাবীও শহীদ হন। এসব ছাড়াও মুসলমানদের সত্যনিষ্ঠা ও ঈমানের এমনই বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিশ্ব ইতিহাসে যার নযির নেই। বিভিন্ন দিক বিবেচনা করলে উপলব্ধি করা যায় যে এ যুদ্ধে মু'মিনদের রক্তপাত বৃথা যায় নি।

ফেরার পথে ঃ ওহুদ হতে মদীনায় ফেরার পথে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ওসবেরই কিছু উল্লেখ করা হচ্ছে। হুযূর (সঃ)-এর শাহাদাতের গুজব ও ইসলামি সেনাবাহিনীর বিপর্যয়ের কথা মদীনায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তাতে মদীনার মহিলা ও ছেলেমেয়েরা উদভ্রান্তের মত ওহুদ প্রান্তরের দিক ছুটতে থাকে। বহুদীনার কাবিলার এক মহিলা ছুটতে ছুটতে ওহুদে পৌঁছে যান। তাঁর স্বামী ভাই ও পিতা এই যুদ্ধে শহীদ হন। কোন কোন বর্ণনা মতে তাঁর এক ছেলেও শহীদ হন। তাঁকে যখন একে একে ওসব খবর দেয়া হলো তখন তিনি বল্লেন, 'রসূল করীম (সঃ)-এর খবর কি' ? খবর দাতারা যখন দেখলেন যে, মহিলার বাপ-ভাইয়ের কোন তোয়াক্কা নেই, তখন তাঁরা তাঁর অনুভূতি বুঝতে পারলেন ও তাঁকে বল্লেন, 'অমুকের মা ! তুমি যেমন চাচ্ছ, রসূল তেমনই আল্লাহ্‌র ফযলে ভালই আছেন'। এতে তিনি বলেন, 'দেখাও তিনি কোথায়' ? তারা বল্লেন, 'সামনে এগিয়ে যাও, পাবে। তিনি ঐ, ঐখানে দাঁড়িয়ে আছেন'। মহিলা এক দৌড়ে রসূল করীম (সঃ)-এর কাছে পৌঁছে গেলেন। এবং তাঁর আঁচল ধরে বল্লেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! আমার বাপ-মা আপনার জন্যে কুরবান, আপনি ভাল আছেন, তখন আমি আর কারো জন্যে চিন্তা করি না'। রসূল-প্রেমের কি অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত। এরূপ আরো একটি ঘটনা উল্লেখের দাবি রাখে। সায়াদ বিন মোয়াদ নামে এক নেতা আঁ হযরত (সঃ)-এর উটনীর লাগাম ধরে মদীনায় ফিরছিলেন। তার বুড়ী মা, যার দৃষ্টি শক্তি খুব ক্ষীণ হয়ে পড়েছিলো তিনিও পথে এসে তাঁদের সাথে মিলিত হন। ওহুদে তাঁর এক ছেলে উমর বিন মোয়ায শহীদ হন। তিনি খুব কষ্টে হুযূর (সঃ)-কে দেখতে পান। এতে তিনি খুব উল্লসিত হয়ে ওঠেন। অপরদিকে রসূলে খোদা বল্লেন, 'মা মণি ! তোমার ছেলে শহীদ হওয়াতে আমি খুব দুঃখ পেয়েছি। আমি আমার সমবেদনা জানাচ্ছি'। একথা শুনে বুড়ী মা বল্লেন, 'হুযূর ! আমি আপনাকে ভাল অবস্থায় দেখেছি, তক্ষুণি আমি আমার সব দুঃখ-বেদনাকে রোষ্ট করে খেয়ে ফেলেছি'। কি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী বাচন ভঙ্গী। ভালবাসার কি গভীর অনুভূতি ! অতি স্বল্প সময়ের অবস্থানে হুযূর (সঃ) তাঁর শিক্ষা, আদর্শ ও আচার-আচরণ দ্বারা সর্বস্তরের লোকদের হৃদয়ে কত উচ্চস্থান করে নিয়েছিলেন তা ভাবতেও অবাক লাগে। এক্ষেত্রেও তিনি অদ্বিতীয়, তিনি সবার শীর্ষে। (চলবে)।

-- মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

ইসলামের খেদমতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝

অর্থ ঃ তিনিই তাঁহার রসূলকে হেদায়াত এবং সত্য-ধর্মসহকারে পাঠাইয়াছেন যেন তিনি ইহাকে সকল ধর্মের উপরে জয়যুক্ত করিয়া দেন, ইহাতে মুশরেকগণ যত অসন্তুষ্টই হউক না কেন" (সূরা সাফ্ফ ঃ ১০)।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, একদিন এই পৃথিবীতে সকল ধর্মের উপর ইসলাম ধর্ম প্রাধান্য বিস্তার করবে এবং বিজয় লাভ করবে। এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই যে, এই বিজয় হযরত মাহ্দী বা মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর দ্বারা সুসম্পন্ন হবে।

সুতরাং একথা পরিষ্কার যে, হযরত মসীহ্ এবং মাহদী (আঃ)-এর কর্মকান্ড হবে বিশ্বব্যাপী ইসলাম-প্রচার। এমন ব্যাপক ও বিশ্বব্যাপী সার্বিক প্রচার যদ্বারা সকল ধর্মের উপর ইসলামের প্রাধান্য ও বিজয় লাভ হয়।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী নিজেও এই দাবী করেছেন যে, আল্লাহ্তাআলা তাঁকে শেষ যুগের সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী করে পাঠিয়েছেন যার সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। তিনি ঘোষণা করেছেন যে, উপরোল্লিখিত আয়াতে ইসলামের যে বিজয়ের কথা বলা হয়েছে সে বিজয়ের উদ্দেশ্যেই তাঁর আগমন।

এ বিষয়ে হাদীসসমূহে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন ঃ

"তোমাদের মধ্যে যাহারা জীবিত থাকিবে, তাহারা দেখিবে ঈসা ইব্নে মরিয়ম ন্যায়-বিচারক, মীমাংসাকারী ইমাম মাহ্দীরূপে আগমন করিবেন। তিনি ক্রুশ (মতবাদ) ধ্বংস করিবেন। শূকর নিধন করিবেন এবং ধর্মের নামে তরবারির যুদ্ধকে রহিত করিবেন (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের জীবনী পাঠ করলে দেখা যায় যে, তিনি আজীবন ইসলামের বিজয়ের জন্যে সংগ্রাম করে গেছেন এবং অত্যন্ত সাফল্যের সাথে ইসলামের বিজয়ের সূচনা করে গেছেন। তিনি (ক) কুরআন শরীফ ও হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সত্যতা প্রবল শক্তিশালী দলিল দ্বারা প্রমাণ করেছেন, (খ) কুরআন ও রসূল (সঃ)-এর সম্বন্ধে যত আপত্তি ও অপবাদ বিরোধীরা আরোপ করেছিল সম্পূর্ণরূপে ওগুলোর খন্ডন করেছেন, (গ) অন্য সকল ধর্মের অসারতা ও অযৌক্তিকতা প্রমাণ করেছেন, (ঘ) মুসলমানদের ভুল ধারণাসমূহকে সংশোধন করেছেন, (ঙ) মু'জিযাসমূহ দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, যেমন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে আল্লাহ্তাআলা প্রতিমুহূর্তে সর্বপ্রকার সাহায্য করতেন, আজ তেমনই আল্লাহ্তাআলা ইসলামের বিজয় দানের জন্যে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) সাহেবকেও অনুরূপ সাহায্য করছেন। যে কেউ ইহা প্রত্যক্ষ করতে পারে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ব পাঞ্জাবের কাদিয়ান নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। ১৮৫১ খৃঃ এদেশে খ্রীষ্টানদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯১,০০০। অতঃপর তাদের এ সংখ্যা ১৮৮১ তে ৪,৭০,০০০ এবং ১৮৮৮ তে দশ লক্ষে উন্নীত হয়।

মুসলমান সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানগণ ইসলাম ত্যাগ করে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এমন কি, বড় বড় মুসলমান আলেমগণ খ্রীষ্টান পাদ্রী হয়ে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে বই লিখেছিলেন। যেমন পাদ্রী আব্দুল হক, পাদ্রী আব্দুল্লাহ্ আথম, পাদ্রী ইমাদুদ্দীন, ফতেহ মসীহ্ প্রমুখ।

আপনারা হয়ত চিন্তা করেছেন যে, মুসলমান আলেমরা কেন খ্রীষ্টান হচ্ছিলেন ?

ঘটনা এই যে, মুসলমান আলেমগণ এমন এমন ভুল বিশ্বাস পোষণ করতেন যার অনিবার্য ফলস্বরূপ এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

প্রথমতঃ আলেমগণ "নাস্খ্ ফিল কুরআন" অর্থাৎ কুরআনের অনেক আয়াতকে বাতিল বলে স্বীকার করতেন। তারা বলতেন, অমুক অমুক আয়াত অমুক অমুক আয়াতকে বাতিল করেছে। এমনকি অনেকে অনেক হাদীস দ্বারা অনেক আয়াতকে বাতিল করেছেন !! এভাবে কুরআনকে সন্দেহজনক কিতাবে পরিণত করে ফেলেছিলেন। অপরদিকে তারা হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে বিশ্বাস করতেন যে, (ক) তিনি মৃতকে জীবিত করতেন, (খ) মাটির তৈরী পাখীকে তিনি জীবন্ত করে আকাশে উড়াতে পারতেন, (গ) ফু দিয়ে অন্ধের অন্ধত্ব দুর করতেন এবং (ঘ) বধিরের বধিরতা এবং কুষ্ঠ রোগীকে রোগমুক্ত করতেন। সর্বোপরি এ-ও বিশ্বাস করতেন যে, হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্তাআলা সশরীরে আকাশে তুলে নিয়েছেন সেখানে তিনি সশরীরে জীবিত আছেন। আবার উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে হেদায়াত দানের জন্যে আকাশ থেকে নেমে আসবেন। আর মুসলমানদের মধ্যে কেউই এমন সম্মান ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবেন না।

এসব আলেম হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সম্বন্ধে বিশ্বাস রাখেন যে, (১) হুযূর (সঃ)-এর সঙ্গে রূহুল কুদুস সর্বদা থাকতেন না ; কিন্তু ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গে সর্বদা রূহুল কুদুস থাকতেন। তিনি শয়তানের স্পর্শ থেকে পবিত্র ছিলেন, কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এমন ছিলেন না, (২) হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কোন সময় গোমরাহ্ ছিলেন, পরে আল্লাহ্তাআলা তাঁকে হেদায়াত দান করেন। তিনি (সঃ) গুণাহ্গার ছিলেন পরে আল্লাহ্তাআলা তাঁর গুণাহ্ মাফ করেন ইত্যাদি (নাউযুবিল্লাহ্)। আর এসব বিশ্বাস কুরআনের আয়াত দ্বারা তারা ব্যাখ্যাও করেছেন। আলেমগণের এসব ভ্রান্ত আকীদার কারণে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাথে তুলনায় ঈসা (আঃ)-কে শ্রেষ্ঠতর মনে হত। পাদ্রীরা এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মুসলমানকে ঘায়েল করত। ফলে, মুসলমানগণ খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করাকে জায়েয মনে করেছিলেন। কারণ, আলেমগণের ব্যাখ্যানুযায়ী ঈসা (আঃ)-এর বুযর্গী অনেক বেশী বলে প্রমাণিত ও স্বীকৃত হতো।

অপরপক্ষে বড় বড় শিক্ষিত মুসলিম নেতাগণ অদ্ভুত অদ্ভুত তফসীর করছিলেন। যেমন ঃ স্যার সৈয়দ আহমদ খান তার তফসীরে লিখেছেনঃ (ক) কুরআনে যে সকল ফিরিশ্তার কথা উল্লেখ রয়েছে বস্তুতঃ এদের কোন অস্তিত্ব নেই বরং আল্লাহ্র অসীম কুদরতের বিকাশমান শক্তিসমূহ যা তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে বহুভাবে বিকশিত হয়ে থাকে, এই সব শক্তিসমূহের বিকাশকেই ফিরিশ্তা বলা হয়েছে।

(তফসীরুল কুরআন, প্রথম খন্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা ঃ আয়নায়ে কামালতে ইসলামের ভূমিকা)।

(খ) নবুওয়তের ওহী সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ "আমি নবুওয়তকে মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতিগত জিনিস বলে মনে করি যা নবীগণের মধ্যে, তাঁদের প্রয়োজনানুসারে অন্যান্য মানবিক ও শারীরিক শক্তিগুলির মতই নিহিত থাকে এবং পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়। (তফসীরুল কুরআন ১ম খন্ড, ৩১ পৃষ্ঠাঃ আয়নায়ে কামালাতে ইসলামের ভূমিকা)।

এমতাবস্থায় মুসলমান আলেমগণ খ্রীষ্টান পাদ্রীদের সাথে ধর্মীয় বিতর্কে (বাহাসে) সহজেই পরাজিত হতেন।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ইসলামের এহেন অবস্থা দেখে বড় ব্যথিত হলেন। তিনি বাল্যকাল থেকে ধর্মপরায়ণ ছিলেন। সমস্ত জাগতিক আকর্ষণ থেকে নিজেকে দুরে রেখে নফল নামায, কুরআন তিলাওয়াত ও যিক্র-আযকারে মগ্ন থাকতেন। মির্যা সাহেব যে ইসলামের এই শোচনীয় অবস্থায় বড় পেরেশান হতেন তার একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। মৌলভী ফতেহ দীন ধরম কোটনিবাসী বর্ণনা করেছেনঃ আমি

অনেক সময় মির্যা সাহেবের নিকট যেতাম। কখনও কখনও রাতেও থাকতাম। অনেক সময় দেখতাম মির্যা সাহেব বড় অস্থির ও বড় কষ্ট পাচ্ছেন। একদিন রাতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখলাম যে, মির্যা সাহেব এত বেশী অস্থির যেমন মাছকে পানি থেকে ডাঙ্গায় তুলে রাখলে হয় অথবা কঠিন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যেমনটি অস্থির হয়। আমি ভীত হয়ে চুপ মেরে রইলাম। সকালে জিজ্ঞাসা করলে মির্যা সাহেব বললেন, "যখন ইসলামের সংগ্রামের কথা স্মরণে এসে যায় এবং আজ ইসলামের উপর যে বড় বড় বিপদ আসছে তা মনে পড়ে যায়, তখন আমার মন-মেজায অস্থির হয়ে যায়। আর ইহা ইসলামেরই জন্যে ব্যথা যা আমাকে এভাবে অস্থির করে তুলে" (সীরাতুল মাহ্দী ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৯), (তারিখে আহমদীয়ত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৬)।

হযরত মির্যা সাহেব শিয়ালকোটে অবস্থান কাল থেকে পাদ্রীদের সাথে বাহাস-মুবাহাসা (তর্ক-বিতর্ক) আরম্ভ করেন। তারপর ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পত্রিকায় লেখা আরম্ভ করেন এবং তখন বিরুদ্ধবাদীদের ইসলামের সাথে মোকাবিলার চ্যালেঞ্জও প্রদান করেন।

অতঃপর ১৮৭৫ খৃঃ আল্লাহ্তাআলার ইশারায় তিনি বরাবর ৮/৯ মাস যাবৎ রোযা ব্রত পালন করেন, কারণ ইসলামী জিহাদের জন্যে বিরাট রূহানী শক্তির প্রয়োজন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি কুরআন এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সত্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে একখানা গ্রন্থ লিখে প্রকাশ করতে যাচ্ছেন যার নাম হবে 'বারাহীনে আহমদীয়া'। তিনি বিধর্মীদের চ্যালেঞ্জ দিয়ে লিখলেন যে, আমি কুরআন ও হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সত্যতার প্রমাণস্বরূপ যে পরিমাণ সাক্ষ্য-প্রমাণ উক্ত গ্রন্থে উপস্থাপন করবো, তোমরা উহাদের সমপরিমাণ যুক্তি-প্রমাণ তোমাদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ থেকে (যা তোমরা আল্লাহ্র কিতাব বলে মনে কর) তোমাদের ধর্মের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন কর। যদি উহার সমপরিমাণ প্রমাণ দিতে না পার তবে, উহার অর্ধেক পরিমাণ, যদি তা-ও না পার তবে এক তৃতীয়াংশ, অথবা এক চতুর্থাংশ, নতুবা এক পঞ্চমাংশ প্রমাণ দাও। যদি তা-ও না পার তবে আমার উপস্থাপিত দলিলসমূহকে খন্ডন করে দেখাও। যদি পার তবে দশ হাজার টাকা পুরস্কার।

'বারাহীনে আহমদীয়া' প্রকাশের পূর্বে যারা প্রতি-উত্তর লিখবেন বলে দাবী করেছিলেন, তারা অথবা অন্য কেউই আজ পর্যন্ত, বারাহীনের প্রতি-উত্তর লিখতে সাহস পান নি বা সাহস দেখান নি।

অপরপক্ষে বড় বড় মুসলমান নেতারা বারাহীনে আহমদীয়ার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যেমন বিখ্যাত 'মনসুরে মোহাম্মদীয়র সম্পাদক মৌলানা মোহাম্মদ শরীফ সাহেব দীর্ঘ মন্তব্য লিখেছেন যে,

"---------- খোদার শুকুর ! আমাদের আশা পূর্ণ হ'ল। ইহা সেই গ্রন্থ যার জন্যে মুসলমানগণ দীর্ঘদিন যাবৎ অপেক্ষায় ছিলেন। ৩০০ দলিল দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে, কুরআন সত্য এবং মুহাম্মদ (সঃ) সত্য। মারহাবা ! কত চমৎকার গ্রন্থ যদ্বারা ধর্মের সত্যতা প্রতি প্রহর প্রকাশ পাচ্ছে। ---------- এ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে লা-জওয়াব (তারিখে আহমদীয়ত ঃ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২১৬)।

মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী লিখছেন ঃ "আমাদের মতে বর্তমান অবস্থায় এটি একটি অতুলনীয় গ্রন্থ, আর কোন যুগে ইসলামী জগতে ইহার তুলনা নেই (ইশায়াতুস সুন্নাহ ঃ ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬৭) ও (তারিখে আহমদীয়ত ঃ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২১১)।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে হযরত মির্যা সাহেব এ যুগের মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবী করেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বড় বড় পন্ডিত, পাদ্রীদের সম্বোধন করে ২০,০০০ বিজ্ঞাপন উর্দূ ও ইংরেজীতে প্রকাশ করেন। রেজিষ্ট্রি ডাক যোগে এই বিজ্ঞাপন তাদের কাছে প্রেরণ করেন। এই বিজ্ঞাপনে তিনি সকলকে ইসলামের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ, ঐশী নিদর্শন দেখারও আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যে কেহ আমার কাছে কাদিয়ানে এক বৎসর কাল অবস্থান করুন। যদি তাকে আমি ঐশী নিদর্শন না দেখাতে পারি, তবে মাসিক ২০০ টাকা হারে জরিমানা দিতে বাধ্য থাকব। যারা কাদিয়ানে এসে থাকবেন তারা অবশ্যই আল্লাহ্র এমন অলৌকিক নিদর্শন দেখবেন, যাতে প্রমাণ হয়ে যাবে যে, আল্লাহ্ ইসলাম ধর্মকে সমর্থন দিচ্ছেন। খ্রীষ্টান ধর্ম ছাড়াও হিন্দু, আর্য, ব্রাহ্ম-সমাজীরা হযরত মির্যা সাহেবের সাথে ধর্মীয় বিতর্কে অবতীর্ণ হন এবং পরাজিত হন। হযরত মির্যা সাহেবের গ্রন্থ 'সুরমায়ে চশমায়ে আরিয়া' ইহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করছে। হযরত মির্যা সাহেব কুরআনের আলোকে সকল ধর্মের অসারতা ও অযৌক্তিকতা প্রমাণ করেন।

প্রথমতঃ ১৮৯১ ইং সালে হযরত মির্যা সাহেবের এই ঘোষণা প্রকাশিত হয় যে, হযরত ঈসা (আঃ) সশরীরে আকাশে জীবিত নেই বরং তিনি মারা গেছেন এবং হাদীস শরীফে যে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমনের কথা বলা হয়েছে, স্বয়ং তিনিই সেই ঈসা (আঃ) (রূহানীভাবে)।

এই দাবী প্রচারের সাথে সাথে চতুর্দিকে বিরোধিতার ঝড় উঠলো। মুসলমান আলেমগণের অধিকাংশ বিরোধী হয়ে গিয়ে হযরত মির্যা সাহেবকে কাফের বলে ফতোয়া দিলেন। শুধু ফতোয়া দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না বরং সকলক্ষেত্রে সর্বতোভাবে বিরোধিতা আরম্ভ করলেন। তারা হযরত মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি (ইন্না লিল্লাহে ---------- রাজেউন)। অপরপক্ষে হযরত মির্যা সাহেব শুধু দাবী করেই ক্ষান্ত হন নি। তিনি নিজ দাবীর পক্ষে কুরআন ও রসূল করীম (সঃ)-এর হাদীসের আলোকে জোরালো এবং অনস্বীকার্য যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করে গ্রন্থাবলী প্রকাশ করতে থাকেন। এ সকল গ্রন্থাবলীতে কুরআন এবং রসূল (সঃ)-এর অতুলনীয় সৌন্দর্যাবলী প্রকাশিত হয়েছে। কারণ বড় দরদ ও ব্যথাভরা পবিত্র হৃদয় নিয়ে (এমন হৃদয় যার উপর আল্লাহ্র বাণী নাযেল হচ্ছিল) ইসলামের ভালবাসায় তন্ময় অবস্থায় লেখা হচ্ছিল। যার ফলে মুসলমানদের ভুল ও ভ্রান্ত ধারণাগুলি দুরীভূত হচ্ছিল এবং সাথে সাথে বিধর্মীদের আরোপিত অপবাদের খন্ডনও হচ্ছিল। হযরত মির্যা সাহেব প্রথমতঃ 'ইযালায়ে আওহাম' গ্রন্থে সবিস্তারে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে এবং অন্যান্য যুক্তি দিয়ে খন্ডন করে দেখান। পরে আরবী ভাষায় 'হামামাতুল বুশরা' ইত্যাদি গ্রন্থাবলী প্রকাশ করে আরব দেশসমূহে প্রচারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। হযরত মির্যা সাহেব পবিত্র কুরআনের অনেকগুলি আয়াত দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু প্রমাণ করেছেন। যেমন সূরা মায়েদার শেষ রুকূ। বিশেষ করে আয়াত নং ১১৬ 'ফালাম্মা তাওয়াফ্ফায়তানী'র সঠিক অর্থ হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রমাণ করেন।

তিনি চ্যালেঞ্জস্বরূপ ঘোষণা করেন যে, যে ব্যক্তি এই আয়াতের (ফালাম্মা তাওয়াফ্ফায়তানী) অর্থ মৃত্যু নয় বরং অন্য কিছু বলে প্রমাণ দিতে পারে তাকে ১০০০/= (এক হাজার টাকা) পুরস্কার দেবেন। তিনি আরও ঘোষণা করেছেন ঃ "যদি তোমরা মুসলমানদের সকল ফিরকার হাদীস গ্রন্থসমূহ খুঁজে দেখ তবুও সহীহ্ হাদীস তো দূরের কথা, কোন ভেজাল (বানানো) হাদীসও এমন পাবে না যেখানে লেখা রয়েছে যে, ঈসা (আঃ) সশরীরে এই মরদেহ নিয়ে আকাশে চলে গেছেন এবং পুনরায় কোন সময় পৃথিবীতে ফেরৎ আসবেন। যদি এমন কোন হাদীস কেউ দেখাতে পারেন তবে তাকে বিশ হাজার টাকা (২০,০০০/০০) জরিমানা দেয়া হবে (রূহানী খাযায়েন ঃ ১৩তম খন্ড, পৃষ্ঠা ২২৫) ও (কিতাবুল বারিয়া ঃ পৃষ্ঠা ১৯২ হাশিয়া)।

হযরত মির্যা সাহেবের যুক্তি-প্রমাণ দেখে বহু আলেম স্বীকার করেছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর আকাশে সশরীরে যাবার কোন মজবুত দলিল প্রমাণ নেই। যেমনঃ (১) মিশরের ভূতপূর্ব মুফতী আল্লামা রশিদ

রেযা বলেছেন, হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্যালেষ্টাইন থেকে হিন্দুস্থানে গমন এবং সেখানে মৃত্যুবরণ করা, লিখিত দলিল-প্রমাণের দিক থেকে এবং বিবেক-বিবেচনার দিক থেকেও অসম্ভব নয় (পত্রিকা আল্ মিনারঃ ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৯০০-৯০১)।

(২) আল্ আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের (মিশর) রেক্টর আল্লামা মাহমুদ সালতুত এক প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করে লিখেছেন "পবিত্র কুরআন ও সুন্নতের মধ্যে এমন কোন নির্ভরযোগ্য দলিল নেই যার উপর ভিত্তি করে এই বিশ্বাস করা যায় এবং নিশ্চিত হওয়া যায় যে, হযরত ঈসা (আঃ)-কে সশরীরে জীবিত আকাশে তুলে নেয়া হয়েছে এবং তিনি সেখানে এখনও অবস্থান করছেন (আর্ রেসালাহ্ঃ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৪২ প্রকাশ ১৫ ই মে, ১৯৪২ইং)।

(৩) মৌলানা আকরম খাঁর তফসীর দেখুন ২য় খন্ড টীকা নং ৩৯ পৃষ্ঠা ৪৬৬-৪৭৫)।

অনুরূপভাবে হযরত মির্যা সাহেব মুসলমানদের অনেক ভ্রান্ত ধারণা বা বিশ্বাসকে কুরআন শরীফের আলোকে সংশোধন করেছেন যাতে ইসলামের চেহারা উজ্জ্বল হয়েছে। এই দিক দিয়ে দেখলে 'আয়ানায়ে কামালতে ইসলাম' হযরত মির্যা সাহেবের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। কুরআনী আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "ওয়া আইয়াদানাহু বি রূহুল কুদুস" (সূরা বাকারাঃ ২৫৪)।

এই আয়াতের তফসীরে মুসলমান আলেমগণ লিখেছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) থেকে কখনও রুহুল কুদ্দুস আলাদা হতেন না। অথচ হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর নিকট অনেক সময় ফিরিশ্তা আসতো না। দেখুন তফসীর ইবনে জারীর, ইবনে কাসীর, মায়ালেম, ফুতহুল বয়ান, কাশ্শাফ, তফসীরে কবীর, তফসীরে হুসাইনী ইত্যাদি। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কুরআনী আয়াত দিয়ে সুন্দরভাবে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে দেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তুলনামূলকভাবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর চেয়ে অনেক বেশী সময় ব্যাপী অধিক শক্তিশালী ফিরিশ্তাগণের সঙ্গ পেতেন এবং সহযোগিতাও পেতেন। খ্রীষ্টানদের এ ধারণা ভুল যে ঃ (১) হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র পুত্র, (২) মানবজাতির গুনাহ্ মাফের খাতিরে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ক্রুশে মারা গিয়ে আবার জীবিত হয়েছেন অথবা বাস্তবিকই মৃতকে জীবিত করতেন ইত্যাদি। রসূলে করীম (সঃ) আল্লাহ্র এত বেশী নৈকট্য-প্রাপ্ত যে, এ নিয়ে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে কোন তুলনাই হয় না। এ বিষয়ে হযরত মির্যা সাহেব যা লিখেছেন, তা শুধু নিজে পড়েই অনুভব করা যায়। ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। 'আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম' পড়ে দেখুন। এতে তিনি সূরা নজমের কি অদ্ভুত ও তুলনাবিহীন তফসীর করেছেন। অন্যান্য বহু আয়াতের অনন্য তফসীরও রয়েছে যদ্বারা ঈসা (আঃ)-এর উপর মহানবী (সঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। এখানে সূরা নজমের প্রাথমিক কয়েকটি আয়াতের শুধুমাত্র অনুবাদ দেয়া হলো।

"কসম নক্ষত্রটির যখন উহা পতিত হয়। তোমাদের স্াথী (মুহাম্মদ-সঃ) পথ-ভ্রষ্টও হয় নাই এবং সে নিজ প্রবৃত্তির বশেও কথা বলে না। ইহা কেবল সুমহান ওহী যাহা (আল্লাহ্ হইতে) অবতীর্ণ করা হইতেছে (আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম ঃ রূহানী খাযায়েন, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১০২ হাশিয়া)।

সাধারণতঃ সব তফসীরকারক আয়াত (সূরা যোহা শেষ পারা)-এর অনুবাদে লিখেছেন যে, আল্লাহ্ তাঁকে গোমরাহ্ পেয়ে হেদায়াত দিয়েছেন। হযরত মির্যা সাহেব লিখেছেন,

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কখনও গোমরাহ (পথভ্রষ্ট) হন নি। যে ব্যক্তি মুসলমান হয়ে এমন বিশ্বাস রাখে যে, হুযূর (সঃ) জীবনে কখনও গোমরাহির কাজ করেছেন- সে কাফের, বেদীন, শাস্তির যোগ্য (আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম ঃ রূহানী খাযায়েন, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭০)।

হযরত মির্যা সাহেব এই আয়াতের অর্থ করেছেন- "আল্লাহ্ তাঁকে (সঃ) যাল অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রেমে আসক্ত পেলেন এবং নিজের নিকটে টেনে নিলেন (ঐ পৃষ্ঠা- ১৭০-১৭১)।

এখানে মাত্র এক লাইন তুলে দেয়া হল। নতুবা বহু পৃষ্ঠা ব্যাপী এই ব্যাখ্যা পড়ে দেখার মত বিষয়।

সূরা ফাতাহ্র ২নং আয়াতে এর অর্থ করতে গিয়ে উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, রসূলে করীম (সঃ)-এর গুনাহ্ আল্লাহ্ মাফ করেছেন। অর্থাৎ রসূল (সঃ) কখনও কখনও গুনাহ্ করেছেন (নাউযুবিল্লাহ্)।

আমাদের বিশ্বাস যে, রসূল (সঃ) পরম পবিত্র নিষ্পাপ আত্মা। তাঁর গুনাহ্ করা অকল্পনীয়। মুসলমান আলেমগণ হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে বলেন যে, তিনি নিষ্পাপ ; শয়তানের স্পর্শেরও বাইরে। অথচ রসূল করীম (সঃ)-কে গুনাহ্গার বলতে ভয় করেন না। এই আয়াতের আসল অর্থ এই যে, রসূল করীম (সঃ)-এর বিরোধিতায় অন্যেরা যে সব গুনাহ্ করেছে বা করবে, তাদের সেই গুনাহ্ আল্লাহ্তাআলা রসূল (সঃ)-এর খাতিরে মাফ করবেন। যেমন, মক্কা বিজয়ের পর রসূল (সঃ) মক্কার কাফেরদেরকে মাফ করেছিলেন। আল্লাহ্ এখানে বলেছেন, এমন গুনাহ্গারদের গুনাহ্ আল্লাহ্ মাফ করবেন। আর আরবী সাহিত্যের নিয়ম মতে এমন অনুবাদ একেবারেই যথাযথ এবং সিদ্ধ।

'নাস্খ ফিল কুরআন' সম্বন্ধে মুসলমান আলেমগণ তফসীরে লিখেছেন যে, কুরআনের অমুক অমুক আয়াত পরবর্তীতে বাতিল হয়েছে। এমনকি কোন কোন আলেম কোন কোন হাদীস দ্বারও কুরআনের আয়াতকে বাতিল করেছেন। যুগে যুগে মুজাদ্দিদগণ চেষ্টা করেছেন ঐ সব আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা উদ্ধার করতে । কিন্তু তারা সম্পূর্ণভাবে তা করতে পারেন নি। হযরত মৌলানা জালালুদ্দীন সিউতি (রহঃ) শেষ পর্যন্ত ১৫ টি আয়াত এবং শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলবী ৫টি আয়াতকে বাতিল বলে স্বীকার করেছেন(দেখুন ফাউযুল কবীর)। হযরত মির্যা সাহেব বল্লেন, অসম্ভব ! কুরআনের কোন আয়াত দূরের কথা, একটি শব্দ বা যের-যবরও বাতিল হতে পারে না। তিনি ঐসব জটিল আয়াতের বড় গভীর মাহাত্ম্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আল্হাম্দুলিল্লাহ্। তিনি দাবী করেছেন, আল্লাহ্ তাঁকে পবিত্র কুরআনের গভীর জ্ঞান দান করেছেন। বর্তমান যুগে পৃথিবীর সমস্ত আলেম মিলিতভাবে চেষ্টা করেও তাঁর মতো নির্ভুল ও দুর্লভ তফসীর করতে সক্ষম হবে না। প্রমাণস্বরূপ তিনি চ্যালেঞ্জ সহকারে কয়েকখানা গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে, সূরা ফাতিহার তফসীর এক অপূর্ব ও অতুলনীয় যা সর্বকালের জন্যে অনতিক্রমণীয় রয়ে যাবে।

হযরত মির্যা সাহেবের আক্রমণাত্মক যুক্তি ও আধ্যাত্মিক শক্তির মোকাবেলায় খ্রীষ্টান পাদ্রীরা পরাজয় বরণ করতে এবং পিছ পা হতে বাধ্য হয়। অনুরূপভাবে হিন্দু, আর্য ও ব্রাহ্ম সমাজীরা সকলেই পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। মুসলমান নেতাগণও মুক্তমনে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন যে, হযরত মির্যা সাহেব ইসলামের পক্ষে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সর্বদাই বিজয়ী হয়েছেন। এখানে একটি মতের উল্লেখকরা হলো ঃ

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডনে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের একটি অধিবেশনের সভাপতিত্ব করতে গিয়ে লর্ড বিশপ অব গ্লস্টার রেভারেন্ড চার্লস এলিকট তাঁর সভাপতির ভাষণে ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলন সম্বন্ধে বলেন, ইসলামে এক নব জাগরণের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। যারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রাখেন, তারা জানিয়েছেন যে, বৃটিশ রাজ্য হিন্দুস্থানে আমরা এক নতুন ধরনের ইসলামের সম্মুখীন হচ্ছি। ইংল্যান্ডের এই দ্বীপেও কোথাও কোথাও এর আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। এই ইসলাম ঐ সব বি'দাতের শক্ত বিরোধী যে সব বি'দাতের কারণে মুহাম্মদ (সঃ)-এর ধর্ম আমাদের চোখে ঘৃণার পাত্র ছিল। এই নব

জাগরণকে অতি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এই নতুন ইসলাম এমন যে, ইহা শুধু আত্মরক্ষাই করে না, বরং প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণও করে। দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদেরও কেউ কেউ ঐদিকে ঝুঁকে পড়েছে (দ্যা অফিসিয়াল রিপোর্ট অব দি মিশনারীজ, কনফারেন্স অব দি অ্যাংলিকান কমিউনিয়ন ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ৬৪)।

সৈয়্যদ মমতাজ আলী সাহেব সম্পাদক, তাহযিবে নিসওয়া পত্রিকা লিখেছেন (লাহোর ১৯০৮ ইং) "মরহুম মির্যা সাহেব অত্যন্ত পবিত্র এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বুযর্গ ছিলেন। তাঁর নেকীতে এত শক্তি ছিল যে, অত্যন্ত কঠিন হৃদয়কে কোমল করে দিত । তিনি বিদগ্ধ আলেম, শক্তিশালী সংস্কারক এবং পবিত্র জীবনাদর্শের অধিকারী ছিলেন। আমরা তাঁকে ধর্মীয়ভাবে মসীহ্ মাউওদ মানি না কিন্তু তাঁর হেদায়াত ও পথ-নির্দেশনা মৃত আত্মাসমূহের জন্যে প্রকৃতপক্ষে মসীহীই ছিল"।

লাহোরের পয়সা পত্রিকার সম্পাদক লিখেছেন, মুসলমানগণ নিশ্চিত থাকুন মির্যা সাহেব কোনদিন ইসলামের ক্ষতি করতে পারবে না। আমাদের বিশ্বাসমতে তিনি এমন ক্ষমতা রাখেন না। যদি হিন্দু ও খ্রীষ্টানগণ মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন তবে শোভনীয় হত। কারণ মির্যা সাহেবের সকল প্রচেষ্টা হিন্দু , আর্য, ও খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে এবং মুসলমানদের পক্ষে ব্যয়িত হচ্ছে। যেমন তাঁর গ্রন্থ বারাহীনে আহমদীয়া 'সুরমায়ে চশমায়ে আরিয়া' ইত্যাদি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। ওমা আলায়না ইল্লাল বালাগ। হ্যাঁ এতটুকু বলে রাখি যে, আমরা হযরত মির্যা সাহেবের অনুসারী নই (২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯২ ইং পয়সা, লাহোর)।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ২৬-২৭-২৮ ডিসেম্বর লাহোরে তিনদিন ব্যাপী এক সর্বধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নিধারিত পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর পড়ে শোনান হয়। এ অনুষ্ঠানে হযরত মির্যা সাহেবকেও তাঁর রচনা পড়ে শোনাবার আহ্বান করা হয়। পূর্ব নির্ধারিত পাঁচটি প্রশ্নের উত্তরে তাঁর যে রচনা পড়ে শোনান হয়, তা "ইসলামী নীতি দর্শন" নামে বঙ্গানুবাদ করে পুস্তকাকারে বহুদিন থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে। মির্যা সাহেবের রচনা পাঠ শেষ হবার আগেই জলসার সময় শেষ হয়ে যায়। তখন উপস্থিত বিমুগ্ধ জনতার দাবীতে বাধ্য হয়ে জলসার ব্যবস্থাপকগণ শুধু এই মহামূল্য প্রবন্ধটি শেষাবধি শোনার জন্যে পরদিন অর্থাৎ চতুর্থ দিন পর্যন্ত সময় বাড়িয়ে দেন। হযরত মির্যা সাহেব পূর্বের থেকে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ্তাআলা তাঁকে খবর দিয়েছেন যে, তাঁর লেখা রচনাটি 'ইসলামী উসুল কি ফিলাসফি' অন্যান্য সকল প্রবন্ধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হবে। জলসায় ৩য় ও ৪র্থ দিন যখন মির্যা সাহেবের এ রচনা পাঠ করা হচ্ছিল তখন বিরাট জন সমাগম হয়েছিল মুহূর্মুহূ 'মারহাবা মারহাবা' ধ্বনিতে সম্মেলনস্থল মুখরিত হয়ে উঠেছিল। সভাশেষে সকলেই একবাক্য স্বীকার করেছেন যে, নিঃসন্দেহে মির্যা সাহেবের রচনাই সর্বশ্রেষ্ঠ ও শীর্ষ স্থানীয়। সেদিন সকল ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

এই সম্মেলনের রিপোর্ট বহু পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। সম্মেলনের শেষে সকল বড় বড় পত্রিকা অত্যন্ত স্পষ্ট ও জোরালো ভাষায় হযরত মির্যা সাহেবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। পত্রিকাগুলোর সকল রিপোর্ট একত্রে প্রকাশ করতে গেলে নিঃসন্দেহে বহু পৃষ্ঠার একখানা বই হবে। অতএব এখানে কয়েকটি লাইন মাত্র উল্লেখ করা হ'ল।

কোলকাতার পত্রিকা "জেনারেল ওয়া গওহার আসফি" ২৪শে জানুয়ারী ১৮৯৭ ইং তারিখে বিস্তারিত রিপোর্ট লিখে-

"মহতী জলসা লাহোর এবং ইসলামের বিজয়"

"---------- জলসার কর্মকান্ড থেকে প্রমাণ দিত হয় যে, একমাত্র কাদিয়ানের রইস জনাব মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবই ছিলেন, যিনি এ প্রতিযোগিতার ময়দানে ইসলামী মল্ল-যুদ্ধের পুরা দায়িত্ব উত্তমরূপে পালন করেছেন। এবং তাঁকে ইসলামের উকিল নিযুক্তির সম্মান তিনি পুরোপুরি রক্ষা করেছেন। পেশাওয়ার , রাওয়ালপিন্ডি, ঝিলাম, শাহ্পুর, ভেরা, খোশাব, শিয়ালকোট, জম্মু, ওজিরাবাদ, লাহোর, অমৃতসর, লুধিয়ানা, শিমলা, দিল্লী, আম্বালা, পাটিয়ালা রাজ্য, কপুরথলা, এলাহাবাদ, মাদ্রাজ, বোম্বাই, হায়দারাবাদ, বাঙ্গালোর ইত্যাদি নগরীসমূহ থেকে তাঁকে ইসলামের উকিল নিযুক্ত করা হয়েছিল। সত্য কথা বলতে হয় যে, উক্ত জলসায় যদি হযরত মির্যা সাহেবের রচনা না থাকত, তবে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সামনে মুসলমানদের শরম ও লজ্জা পেতে হত। কিন্তু আল্লাহ্র শক্তিশালী হাত সেদিন ইসলামকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করেছে এবং ঐ রচনার কারণে এমন এক বিজয় লাভ হ'ল যে, আপন তো বটেই অপর বিরোধীরাও স্বভাবগত সততার কারণে বলে উঠলেন "এই রচনাই শ্রেষ্ঠ ছিল--------। যদিও এটা মহতী ধর্মীয় জলসা ছিল, কিন্তু এর শান-শওকত বাকী অন্যান্য সকল কংগ্রেস ও কনফারেন্স এর গৌরবকে ম্লান করে দিয়েছে। হিন্দুস্থানের বড় বড় এলাকার রইসগণ উপস্থিত ছিলেন। জলসার পরিচালনার জন্যে ছয়জন ভারতবরেণ্য বড় বড় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিযুক্ত ছিলেন-----" (তারিখে আহমদীয়ত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৩)।

হযরত মির্যা সাহেবের রচনা সম্পর্কে পত্রিকা চৌদ্দুই সাদী, রাওয়ালপিন্ডি লিখেছে । "--------- জীবনভর কোন কর্ণ এমন সুমধুর বক্তৃতা শ্রবণ করে নি। অন্যান্য ধর্মের বক্তারাও বক্তৃতা করলেন। সত্যি বলতে কি, তাঁরা চতুর্থ প্রশ্নের উপরই থাকলেন। ------ শুধুমাত্র মির্যা সাহেবের বক্তৃতায়ই প্রত্যেক প্রশ্নের পৃথক পৃথক ও বিস্তারিত উত্তর ছিল এবং উপস্থিত সকলে একান্ত মনোযোগ সহকারে মন্ত্র-মুগ্ধের মত শ্রবণ করেছেন এবং এই বক্তব্যকে মহা মূল্যবান বলে মনে করেছেন। আমরা মির্যা সাহেবের মুরিদ নই কিন্তু আমরা ইনসাফকে (ন্যায়-বিচার) যবাই করতে পারি না। ---------- মির্যা সাহেবের বক্তৃতার -------- অপূর্ব সৌন্দর্য ছিল ---------- মির্যা সাহেবের বক্তৃতা এবং অন্যান্য বক্তৃতার মধ্যে পার্থক্য এই যে, মির্যা সাহেবের বক্তৃতার সময় জনতা এমনভাবে ভীড় করেছিল যেমন মৌমাছিরা মৌচাকের উপরে ভীড় জমায়, কিন্তু অন্যান্য বক্তৃতার সময় শ্রোতারা বসে থেকে থেকে, উঠে চলে যেতেন। ---------- যাই হোক না কেন, কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি যে, এই জলসায় ইসলাম প্রভাব বিস্তার করেছে। যদিও মুখে কেউ স্বীকার করুক বা না করুক। ------" (১লা ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭ ইং, তারিখে আহমদীয়ত ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৯০)।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ২০-২১-২২ জুন তারিখে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ৬০ তম বার্ষিকীতে জুবিলী উদযাপিত হচ্ছিল। সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য জুড়ে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছিল। সেদিন হযরত মির্যা সাহেব "তোহফায়ে কায়সারিয়া" নামক গ্রন্থ লিখে, ইহাকে মহারাণীকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে উপহার দিয়েছিলেন। আজ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জামাত আল্লাহ্র নির্বাচিত একজন খলীফার নেতৃত্বে, সারা পৃথিবীতে ইসলাম তথা আল্লাহ্র তৌহীদ ও মুহাম্মদ (সঃ)-এর রেসালৎ প্রচার করতে দিনরাত ব্যস্ত রয়েছে। সমগ্র পৃথিবীর সকল মানুষকে কুরআনের মর্মবাণী শেখাবার নিমিত্তে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করে যাচ্ছে। শতাধিক ভাষায় আল্লাহর বাণী কুরআন ও মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাণী (হাদীস) প্রচার ও প্রকাশ করে চলেছে। সকল জাতির মানুষ আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের চেষ্টার ফলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সমবেত করা হচ্ছে। দেশ-বিদেশে হাজার হাজার মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে। সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত আযানের ধ্বনি উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে। এককালের ত্রিত্ববাদীর মুখে আজ তৌহীদের আযান উচ্চারিত হচ্ছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইমাম মাহ্দী ও মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর খেলাফত

নিঃসন্দেহে আজ সারা পৃথিবীতে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে এগিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্‌র ফযলে অবস্থা এমনি দাঁড়িয়েছে যে, পাদ্রী বা পন্ডিত আহমদীদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় বাহাস-মোবাহাসা (তর্ক-যুদ্ধ) করতে সাহস করে না। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর ইসলাম সেবার মান কত উন্নত পর্যায়ের কত গভীর এবং কত সুদূর প্রসারী। হযরত মির্যা সাহেব বলেছেন ঃ

"তুমি ঐ করুণাময় রসূল (সঃ)-এর প্রতি প্রত্যহ শত শতবার দুরূদ পাঠ কর। পুঁত-পবিত্র মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) নবীগণের প্রধান (দুররে সামীন)।

তিনি আরো বলেছেন ঃ

"মানব জাতির জন্যে জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নেই এবং আদম-সন্তানের জন্য বর্ত্তমানে মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) ভিন্ন কোন রসূল এবং শাফাআতকারী নেই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরবান্বিত নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাউকেও তাঁর উপর কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান কোরও না, যেন আকাশে তোমরা মুক্তিপ্রাপ্ত বলে পরিগণিত হতে পার" (আমাদের শিক্ষা , কিশ্‌তিয়ে নূহ)।

তাঁর মহামূল্য উপদেশ ঃ "আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তারা যেন বিশুদ্ধ-চিত্তে পবিত্র কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান নিয়ে মরে" (রূহানী খাযায়েন ঃ ১৪ খন্ড, আইয়ামুস সুলেহ্‌, পৃষ্ঠা ৩২৩)।

মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
সদর মুরব্বী

কাশ্মীরের কার্গিল-এর অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলী

মূল- জুবাইর খলীল খান, জার্মানী

কাশ্মীর এবং উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত সামরিক ঘাঁটিসমূহ এতবেশী বরফে আচ্ছাদিত হয়ে যায় যে, প্রত্যেক শীত মৌসুমে উভয় দেশ (ভারত এবং পাকিস্তান) নিজ নিজ ঘাঁটি ছেড়ে নীচে চলে আসে। শীতকালে এটা না করে উপায় নেই। সেখানকার বায়ূ এতই শীতল এবং বরফ এত বেশী জমে যায় যে, জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। আবার যখন শীতের প্রকোপ কমে যায় তো ভারত ও পাকিস্তানের সৈন্যরা পাহাড়ের চূড়ায় নিজ নিজ সামরিক ঘাঁটিসমূহে ফিরে যায়। কোন বছর তারা এপ্রিল মাসে যায় আবার কোন বছর মে মাসের প্রথম দিকে পাহাড়ের চূড়ায়ে ফিরে যায়।

এই বছর একটা অসাধারণ ঘটনা এই ঘটলো যে, কিছু মুক্তিযোদ্ধা আগে ভাগে গিয়ে এমন কয়টি গুরত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটির উপর নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠা করল যেগুলো ১৯৭২ সালে কার্গিল এলাকায় ভারত যুদ্ধ করে পাকিস্তান থেকে কেড়ে নিয়েছিল। এই সফল অভিযানের ফলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষে শ্রীনগর কার্গিল মহাসড়কের ব্যবহার বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। বলা যায় যে, মুক্তিযোদ্ধাদের এই সামরিক ঘাঁটির দখল ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের জন্যে জীবন-মরণ সমস্যা হয় দাঁড়িয়েছে।

উপরোল্লেখিত অবস্থা অনুধাবন করার জন্যে অতীতের ইতিহাসের দিকে নজর দিতে হয়। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে এইসব জায়গা ভারত পাকিস্তানের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল। পরে তাসকন্দের চুক্তি অনুসারে এই এলাকা পাকিস্তান ফিরে পেয়ে ছিল। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে আবার ভারত পাকিস্তানের কাছ থেকে এই অঞ্চল কেড়ে নেয় এবং খালি করতে সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করে। পরে ভারত যুদ্ধ বিরতি রেখার নাম পরিবর্তন করে নিয়ন্ত্রণ রেখা নাম দেয় এবং এই এলাকা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখে। ১৯৮৪ সালে ভারত চুপিসারে সিয়াচিন হিমবাহ অঞ্চলও দখল করে নেয় এবং তাকে নিজ ভূমি বলে ঘোষণা দেয় এবং নিয়ন্ত্রণ রেখাকে সাল্‌তোরো রেঞ্জ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে দেয়। ১৯৮৪ থেকে পাকিস্তান এসব অঞ্চল অর্থাৎ সিয়াচিন ইত্যাদি এলাকা ফেরৎ নেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে কিন্তু বরাবরই বিফল হচ্ছে।

১৯৭১ সালের পর এই প্রথম এমন ঘটলো যে, মুক্তিযোদ্ধারা কার্গিল এর কয়েকটি স্থান এই পুনর্দখল করেছে এটা সত্যই একটা অত্যাশ্চর্য ঘটনা। এই সামরিক ঘাঁটিসমূহ দখলের ফলে ভারতীয় সরবরাহ পথ মুক্তিযোদ্ধাদের গোলাগুলির আওতায় এসে গেছে।

এই সামরিক অপারেশনের সব চাইতে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, মুক্তিযোদ্ধারা ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্মিত মজবুত ব্যাংকারসমূহ ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে যার ভেতর সমরাস্ত্র ও খাদ্য সামগ্রীর কোন অভাব নেই। সেই ব্যাংকার এর ওপরে গোলাগুলির কোন আঁচড়ও লাগে না। ঐ সব সামরিক ঘাঁটিতে শীতকালে ব্যবহার উপযোগী প্রচুর পরিধেয় এবং ঔষধের বিরাট ভান্ডারও মজুদ আছে। বলা যেতে পারে যে, "কাশ্মীর মুক্তিযোদ্ধারা ভারতের খরচেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধরত আছে"। এমনিও কাশ্মীরী মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল ভারতীয় সেনাদের চাইতে অনেক বেশী দৃঢ়। তাদের উপর প্রচন্ড শীত ও 'বাতাসে অক্সিজেন স্বল্পতা' ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে না। জন্মগতভাবে তাদের ফুস্‌ফুসে সমতলভূমির লোকদের চাইতে অক্সিজেন টানার ক্ষমতা ২৫ শতাংশ বেশী থাকে। এবং আল্লাহ্‌তাআলা স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের পা ও পেশীসমূহ এমন করে বানিয়ে দিয়েছেন যা ঐ পরিবেশের জন্যে অত্যন্ত উপযোগী। ভারত যতই নতুন সৈন্য আনুক না কেন নতুন লোকদের ঐ উঁচু পাহাড়ী এলাকার আবহাওয়া ও পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে কমপক্ষে দু'মাস সময় তো লাগবেই লাগবে !

শেষ খবর আনুযায়ী সেই অঞ্চলে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বড় রকম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বেশী সুবিধাজনক কৌশল লাভ হয়ে গিয়েছে। তাদের পিছু দিকে নিয়ন্ত্রণ রেখা অর্থাৎ পাকিস্তানী এলাকা তাদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিচ্ছে। সিয়াচিন হিমবাহের ভারতীয় সৈন্যদের জন্যে স্থলপথে রসদ সরবরাহের পথ ইতোমধ্যেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন তাদের নিকট কেবল বিমান পথেই সরবরাহ প্রেরণ করা সম্ভব। কিছুদিন পূর্বে ভারত হুমকি দিয়েছে যে, মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে এমন সামরিক হাতিয়ার ব্যবহার করা হবে যেগুলো রাসায়নিক হাতিয়ারের সমতুল্য। সেটা অত্যন্ত বিপজ্জনক পন্থা এবং সেটা করলে ঐ অঞ্চলের জন্যে ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনবে। কিন্তু যদি বর্তমান পরিস্থিতি চলতে থাকে আর মুক্তিযোদ্ধারা আগামী শীতকাল পর্যন্ত কার্গিল এর ব্যাংকারগুলো নিজ দখলে রাখতে সক্ষম হয় তো খুব সম্ভব কাশ্মীর সমস্যার এক বিরাট পরিবর্তন ঘটবে অর্থাৎ এর এক নতুন ও ইতিবাচক রূপ প্রকাশ পাবে। দেখা যাক অদৃশ্যের পটপরিবর্তনে এই নাটকের কোন্ দৃশ্য মঞ্চায়িত হয়।

(১৫-৬-৯৯ তারিখের ইন্টান্যাশনাল আল্ ফযল থেকে)

অনুবাদ- **নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী**

'কেদরের সমস্ত প্রতাপ লুপ্ত হবে'

দুই

ভোর হলো। শুক্রবার। ২য় হিজরীর রমযান মাসের ১৭ তারিখ (১৭ই মার্চ, ৬২৩ খৃষ্টাব্দ) (ইবনে হিশাম ও ইবনে সা'দ)। ফজরের নামাযের পরে হুযূর (সঃ) জেহাদের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত খুতবা দিলেন। বেলা উঠতে উঠতে তিনি মুসলিম সেনাবাহিনীকে সংগঠিত করতে লাগলেন। সা'দ (রাঃ) নামক একজন মুজাহিদ লাইনের বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। নবী করীম (সঃ) তাঁর তীর দ্বারা তাকে লাইনে প্রবেশ করার ইঙ্গিত করলেন। এতে হঠাৎ করে সা'দের বুকে তীর স্পর্শ করলো। তখনি তিনি অভিযোগ উত্থাপন করে বল্লেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আল্লাহ্ কি সত্য ও ন্যায়-বিচারসহ আপনাকে আবির্ভূত করেন নি ? তবে কেন আপনি অন্যায়ভাবে আমাকে তীরের আঘাত দিলেন। আমি এর প্রতিশোধ নিতে চাই। সাহাবা কেরাম তো খুবই দুঃখিত হলেন। কিন্তু নবী করীম (সঃ) শান্ত কণ্ঠে বল্লেন, ওহে সা'দ ! তুমিও তোমার তীর দ্বারা আমাকে আঘাত করো ! সা'দ এক পা অগ্রসর হয়ে হুযূর (সঃ)-এর বুকের কাপড় উঠিয়ে সেখানে চুমু খেলেন। হুযূর (সঃ) বল্লেন, তুমি এরূপ করছো কেন ? তিনি খুবই আবেগ জড়িত কণ্ঠে বল্লেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমরা শত্রুর মোকাবেলা করতে যাচ্ছি। পুনরায় ফিরে আসার সৌভাগ্য হয় কিনা, তাই আমার মন চাইলো শহীদ হওয়ার পূর্বে আপনার পবিত্র দেহের সুখ-স্পর্শ লাভ করি (ইবনে হিশাম)। ইতোমধ্যে হুযায়ফা বিন ইয়ামান ও আবূ জাবল আসলেন। তারা নিবেদন করলেন যে, এই মাত্র তারা মক্কা থেকে এসেছেন। কুরায়েশরা তাদের এ শর্তে ছেড়ে দিয়েছে যে, তারা কুরায়েশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন না। হুযূর (সঃ) বলেন, "তোমাদের প্রতিজ্ঞা পালন করা উচিত। আমরা কেবল আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করছি এবং তাঁর ওপরেই নির্ভর করছি" (মুসলিম কিতাবুল জিহাদ)। এখানে ওয়াদা পালনের প্রতি নবী করীম (সঃ)-এর শিক্ষা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

তখনও তিনি কাতার ঠিক করায় নিয়োজিত ছিলেন। এমনি সময়ে কাফের সৈন্যরা অগ্রসর হওয়া আরম্ভ করলো এবং তাদের নিকট মুসলিম সৈন্য খুবই কম দৃশ্যমান হলো। এতে তারা গর্বে স্ফীত হয়ে ধেয়ে আসলো। নবী করীম (সঃ) এতদ্দর্শনে দোয়া করলেন, হে প্রভু ! তারা খুবই গর্ব ও ক্রোধভরে এগিয়ে আসছে তোমার প্রতিষ্ঠিত ধর্মকে ধ্বংস করার জন্যে, তুমি করুণা বর্ষণ করো। আমি তোমার সাহায্য চাই। তোমার ধর্মের সহায়তা করো (ইবনে হিশাম ও তাবারী)। এর মধ্যে কুরায়েশদের কতিপয় লোক মুসলমানদের অধিকৃত ঝর্ণা থেকে পানি নিতে আসলে মুসলমানরা তাদের বাধা দিতে চাইলে হুযূর (সঃ) তাদেরকে পানি পান করার অনুমতি দিতে বল্লেন। মানবীয় প্রয়োজনীয় দিকটাকে নবী করীম (সঃ) খুব বেশী বড়ো করে যে দেখতেন এতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

উভয় সৈন্য দল এখন সামনা-সামনি উপস্থিত। কুরায়েশরা মুসলিম সৈন্যদেরকে তাদের সংখ্যা থেকে দ্বিগুণ দেখতে পেলো অথচ মুসলমানরা কুরায়েশদেরকে দেখলো তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যক (সূরা আনফাল ঃ ৪৫)। কুরায়েশরা উযায়ের বিন ওয়াহ্‌হাবকে পাঠালো মুসলিম সৈন্যদের আসল সংখ্যা নিরূপণের জন্যে আর তাদের পেছনে কোন সাহায্যকারী সেনাবাহিনী আছে কিনা তা উদ্ভাবন করার জন্যে। উযায়ের ঘোড়া ছুটিয়ে মুসলিম সেনাবাহিনীর চারদিকে একবার ঘুরে এসে যে রিপোর্ট দিলো তা হলো এই ঃ হে কুরায়েশ দল ! তাদের পেছনে গোপন কোন সেনাবাহিনী নেই। তাদের সৈন্যবাহিনী যদিও ছোট কিন্তু ইয়াসরেবের উটের ওপরে আমি মৃত লাশগুলো দেখে আসলাম। তারা তরবারীর ছায়ার আশ্রয়ে আছে। তাদের একজন মানুষও আমাদের একজন লোককে হত্যা না করে মরবে না এবং যখন তাদের সমসংখ্যক লোক আমাদেরও মারা যাবে তখন আমাদের বেঁচে থেকে কী লাভ হবে ? (ইবনে হিশাম, তাবারী, ইবনে সা'দ)। উযায়েরের কথায় কুরায়েশরা বিচলিত হলো। সোরাকা বিন মালিক এতই প্রভাবিত হলো যে, সে যুদ্ধ ক্ষেত্র ছেড়ে চলে গেলো। কেউ তাকে বারণ করলে সে বল্লো, "নিশ্চয় আমি যা দেখি তোমরা তা দেখো না" (সূরা আনফাল : ৪৯)।

যখন হাকীম বিন হিশাম মুসলিম সেনাবাহিনী সম্বন্ধে উযায়েরের বিবরণ শুনলো তখন সে উতবা বিন রবিয়াকে আমর বিন হাজরামীর আত্মীয়-স্বজনকে রক্ত-পণ দিয়ে কুরায়েশদের মক্কায় ফিরিয়ে নেবার প্রস্তাব করলো [এখানে উল্লেখ থাকে যে, কিছুদিন পূর্বে একদল মুসলমান নবী করীম (সঃ)-এর আদেশ ব্যতিরেকেই আমর বিন হাজরামীকে মদীনার নিকটবর্তী স্থানে হত্যা করে ফেলেছিলো] সে-ও কতকটা রাজী হলো এবং বল্লো, আসলে মুসলমানরা তো আমাদের ভাই-ই। যাও আবুল হিকামের নিকট গিয়ে আমাদের প্রস্তাব পেশ করো (ইবনে হিশাম ও তাবারী)। এদিকে সে তার উটের ওপরে চড়ে লোকদেরকে বুঝাতে লাগলো যে, আত্মীয়দের মধ্যে যুদ্ধ করা ঠিক নয়। কুরায়েশদের ফিরে যাওয়া উচিত। মুহাম্মদের ব্যাপারটি অন্য আরব গোত্রদের নিকট ছেড়ে দাও। আর মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করাও চাট্টিখানি কথা নয়। তোমরা আমাকে ভীরু বলতে পারো; কিন্তু আসলে আমি ভীরু নয়। আমি তো এ লোকগুলোকে মৃত্যুর সাথে সদায় করতে দেখছি। হুযূর (সঃ) দূর থেকে উতবাকে দেখে বল্লেন, যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে ভদ্রতা থেকে থাকে তো ঐ লাল রং এর উটের আরোহীর মধ্যে আছে। যদি এসব লোক তার কথা শুনে নেয় তাহলে তা তাদের জন্যে কল্যাণজনক হবে।

যখন হাকীম বিন হিযাম আবূ জাহলকে তার পরিকল্পনার কথা বল্লো তখন আবূ জাহল বল্লো, "বেশ উতবা বেশ, এখন বিরুদ্ধবাদীদেরকে আত্মীয় হিসেবে দেখছে, তাই না ?" তখন সে উমায়ের হাজরামীকে ডেকে বল্লো, "তুমি কি শুনেছো তোমার বন্ধু উতবা কী বলছে? আর তা-ও এ সময়ে যে, আমরা তোমার ভাই-এর মৃত্যুর বদলা নিতে যাচ্ছি ? উমায়ের রাগে অগ্নি শর্ম্মা হয়ে আরবের রীতি অনুযায়ী কাপড় ছিঁড়তে লাগলো, এই বলে যে, হায় আমর ! হায় আমর ! তোমার হত্যার প্রতিশোধ আর নেয়া বুঝি হোল না ! এতে কুরায়েশদের মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি করলো এবং তারা যুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত করলো। আবূ জাহলের কটাক্ষে উতবা তার ভাই শায়বা ও পুত্র ওয়ালীদকে নিয়ে আরব রীতি অনুযায়ী মুসলমানদেরকে মল্ল-যুদ্ধের আহ্বান জানালো। কয়েকজন আনসার এতে জবাব দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু নবী করীম (সঃ) তাদেরকে বাধা দিলেন এবং তাঁর (সঃ) নিকটাত্মীয়দের মধ্য থেকে হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব, আলী বিন আবি তালীব ও উবায়দা বিন মুত্তালিবকে এগিয়ে যেতে আদেশ করলেন। হুযূর (সঃ) তাঁর নিকটাত্মীয়দের এজন্যে প্রথমে পাঠালেন যেন তাঁর (সঃ) প্রতি পক্ষপাতিত্বের দোষারোপ না উঠে। হযরত উবায়দা ওয়ালীদের সাথে হযরত হামযা উতবার সাথে এবং হযরত আলী শায়বার সাথে মল্ল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন এবং এতে হযরত হামযা ও আলী তাঁদের প্রতিপক্ষকে নিহত করে ফেল্লেন এবং হযরত উবায়দা ও ওয়ালীদ উভয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে ভূতলশায়ী হলেন। হযরত ওবায়দা মদীনায় ফেরার পথে ইন্তেকাল করেন।

মল্ল-যুদ্ধের পরে হুযূর (সঃ) পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করতে নিষেধ করে তাঁর (সঃ) তাবুতে ফিরে গেলেন। তবে শত্রুরা যদি অগ্রসর হয় তাহলে তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করার আদেশও দিয়ে গেলেন। কুরায়েশদের সাথে এমন কতক লোক যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আসতে বাধ্য হয়েছিলেন যারা মুসলমানদের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। যেমন, আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব, আবুল বখতারী। হুযূর (সঃ) তাদের ব্যাপারে ভেবে-চিন্তে কাজ

করতে আদেশ দিলেন। কিন্তু অবস্থা কতকটা এরকম হয়ে গিয়েছিলো যে, আবুল বখতারী বাঁচতে পারেন নি (তাবারী)।

হুযূর (সঃ) স্বীয় তাবুতে ফিরে দোয়া আরম্ভ করলেন। হযরত আবূ বকর তাঁর সাথে ছিলেন। হযরত সা'দ বিন মুআয-এর নেতৃত্বে একদল আনসার নবী করীম (সঃ)-এর তাবু পাহারা দিচ্ছিলেন। হুযূর (সঃ) অতীব কাতরচিত্তে দোয়া করলেন, "আল্লাহুম্মা ইন্নী আনসুদকা আহদাকা ওয়া ওয়া' দাকা আল্লাহুম্মা ইন তুহলিক হাযিহিল 'ইসাবাতা মিন আহলিল ইসলামী লা তু'বাদা ফিল আরয অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ্ ! তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ করো, হে আমার আল্লাহ্ ! যদি মুসলমানদের এ জামাত আজ এই রণ-ক্ষেত্রে ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে বিশ্বে তোমার ইবাদত করার কেউ বাকী থাকবে না (বুখারী ও মুসলিম)। তখন তিনি (সঃ) আল্লাহ্তাআলার এত নৈকট্যপ্রাপ্ত ছিলেন যে, একবার তিনি (সঃ) সিজদায় যাচ্ছেন একবার দাঁড়িয়ে খোদাকে ডাকছেন আর তাঁর (সঃ) চাদর তাঁর কাঁধ থেকে পড়ে যাচ্ছে এবং হযরত আবূ বকর তা উঠিয়ে উঠিয়ে দিচ্ছেন (মুসলিম, তিরমিযী)। হযরত আলী বলেন, যুদ্ধ করার সময়ে আমার কেবল নবী করীম (সঃ)-এর কথা স্মরণে আসতো। আমি যখনই তাঁকে দেখতে যেতাম তখনই দেখতাম তিনি (সঃ) সিজদায় পড়ে আকুতি-মিনতি করছেন আর বলছেন, ইয়্যা হায়্যু ইয়্যা কাইয়্যুমু-ইয়া হায়্যু ইয়্যা কাইয়্যুমু অর্থাৎ হে চিরঞ্জীবী-জীবনদাতা, হে চিরস্থায়ী স্থিতিদাতা- হে চির ঞ্জীবি-জীবনদাতা, হে চিরস্থায়ী স্থিতিদাতা (নিসাঈ, ইবনে সা'দ)। হযরত আবূ বকর এ অবস্থা দেখে খুবই বিচলিত হতেন, আর কখনও বলতেন, হে আল্লাহ্র রসূল ! আমার পিতা-মাতা আপনার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত হোক! আপনি ঘাবড়াবেন না। আল্লাহ্ স্বীয় প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ করবেন (মুসলিম)।

অন্যদিকে যখন উভয় সেনাবাহিনী গর্জে উঠেছিলো তখন কুরায়েশ সর্দার আবূ জাহল এভাবে দোয়া করছিলো ঃ হে খোদা! ঐ দলটি যারা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছে এবং এক বি'দাত সৃষ্টি করেছে তাদেরকে এ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ধ্বংস ও বিনাশ করে দাও (ইবনে হিশাম)। বুখারীর সূরাতুল আনফালের এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তখন আবূ জাহল এ দোয়া করেছিলো, "হে আমাদের প্রভু ! যদি মুহাম্মদ কর্তৃক আনীত ধর্ম সত্য হয় তাহলে আমাদের ওপরে আকাশ থেকে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করো অথবা অন্য কোন কঠিন আযাব দ্বারা আমাদের ধ্বংস করে দাও"। আবূ জাহলের এ দোয়া একবার প্রমাণ দেয় যে, এ অভিযানে কুরায়েশ সর্দার আবূ জাহলের এ আকাঙ্ক্ষা ছিলো যেন ইসলাম ও মুসলমানগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আমর হাজরামীর হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার বাহানায় কুফর গোষ্ঠিকে উৎসাহিত করা ছলনার নামান্তর ছিলো।

এখন যুদ্ধ-ক্ষেত্রের দৃশ্যটি অবলোকন করা যাক। একটি অসম যুদ্ধে যেখানে কুরায়েশবাহিনী রণসাজে সজ্জিত হয়ে গগণ বিদারী হুঙ্কারে আস্ফালন করছে সেখানে অন্যদিকে বেচারা মুসলমানগণ স্বল্প সংখ্যক যোদ্ধা ও নাম মাত্র অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে 'কারবালার ময়দানে জয়নাল আবেদীন'-এর মত দাঁড়িয়ে। তারা কেবল তৌহীদ ও রেসালতের রক্ষার্থে খোদার পথে শাহাদতের পেয়ালা পান করার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছেন। আল্লাহ্ ও রসূল (সঃ)-এর প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাসে ভরপুর হয়ে তারা বিশ্ব ইতিহাসের এক অপরাজেয় সৈন্য বাহিনীর রূপ পরিগ্রহ করলো। হযরত হামযা, আলী ও যুবায়ের কুরায়েশ সৈন্যদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করে দিয়েছিলেন ইতোমধ্যে। যখন সাধারণ যুদ্ধ আরম্ভ হলো তখন মক্কার একজন সর্দার হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফের বর্ণনা মতে জানা যায়। তিনি তার ডানে ও বামে দু'টি যুবককে যুদ্ধ করতে দেখলেন। তাদের একজনের নাম মুআয ও অন্যজন্যে মুআউয। সাধারণতঃ নেতাদের আশে পাশে তাদের সংরক্ষক হিসেবে সুনিপুণ যোদ্ধারা অবস্থান করে থাকে। কিন্তু এ যুবকদের দেখে তিনি রীতিমত দমে গেলেন। এই চিন্তা শেষ না হতেই ডান পার্শ্বের যুবক কনুই-এর গুঁতো দিয়ে হযরত আব্দুর রহমান আওফকে চুপিসারে জিজ্ঞেস করলো, চাচা! আবূ জাহল কোন্‌টি, যে মক্কায় আমাদের নবী করীম (সঃ)-এর ওপরে নির্যাতন করেছে। তিনি কথা বলতে যাচ্ছিলেন অমনি বাম পার্শ্বের যুবকটিও তদনুরূপ কনুই-এর গুঁতো মেরে জিজ্ঞেস করলো, চাচা! আবূ জাহল কোন্‌টি। হযরত আব্দুর রহমান বলছেন, আমি এ যুবকদের সাহস দেখে আশ্চার্যান্বিত হলাম যে, সামান্য যুবক হয়ে কী করে একজন জেনারেলের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারে ?

তাদের কথায় তিনি যেই না অঙ্গুলী নির্দেশ করে সৈন্য পরিবেষ্টিত ও যুদ্ধ সাজে সজ্জিত আবূ জাহলকে দেখিয়ে দিলেন অমনি দু'টি যুবক বাজপাখীর ন্যায় দুর্বার গতিতে কাফেরদের ব্যূহ ভেদ করে ঢুকে গিয়ে অকস্মাৎ আবূ জাহলকে আক্রমণ করে ধরাশায়ী করে ফেল্লো (বুখারী কিতাবুল মাগাযী)। আবূ জাহলের পুত্র ইকরামা তার সাথে ছিলো। সে পিতাকে তো রক্ষা করতে পারলো না কিন্তু মুআযকে আক্রমণ করে তার বাম হাত কেটে ফেল্লো। ইহা চামড়ার সাথে ঝুলছিলো। মুয়ায তার পিছু নিলো কিন্তু সে পালাতে সক্ষম হলো। যেহেতু কর্তিক হাত ঝুলতে ছিলো তিনি পায়ের নিচে রেখে তা টেনে ছিঁড়ে ফেল্লেন এবং যুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু শত্রুপক্ষের লোক সংখ্যা ও অস্ত্রাদি বেশী থাকার কারণে কিছুই করা গেলো না।

নবী করীম (সঃ) তখনও দোয়ার ব্যাপৃত ছিলেন। দীর্ঘ সময় পরে তিনি (সঃ) সিজদা থেকে উঠলেন এবং এ আয়াত পাঠ করতে করতে তাবু থেকে বের হলেন -- সা ইউহ্যামুল জাম'উ ওয়াল ইউয়াদ্দুনাদ্দুবুরা অর্থাৎ অচিরেই সেই দল পরাভূত হবে এবং তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে (সূরা আল্ কমর ঃ ৪৬)।

আঁ হযরত (সঃ) তুমুল যুদ্ধ চলতে দেখলেন। তিনি এক মুষ্ঠি কংকর ও বালু নিয়ে শত্রুর দিকে নিক্ষেপ করলেন আর জোর দিয়ে বল্লেন, শাহাতিল উজূহু অর্থাৎ শত্রুর মুখ ধ্বংস হোক (তাবারী, যুরকানী) এবং মুসলিম সৈন্যদের শৃঙ্খলার সাথে যুদ্ধ করতে আদেশ দিলেন। মুসলমানদের কানে তাদের প্রিয়তমের আওয়াজ আসার সাথে সাথে তারা তকবীর ধ্বনি (আল্লাহু আকবার) দিয়ে শত্রুর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন (তাবারী)। ঐ দিকে তাঁর (সঃ) এক মুষ্টি বালি নিক্ষেপের ফলে কাফেরদের দিকে ভীষণ ধূলি-ঝড় প্রবাহিত হতে আরম্ভ হলো। এতে শত্রু পক্ষের চোখ, কান, মুখ, বালি ও কাঁকরে ভরে গেলো (যুরকানী)। তিনি (সঃ) বল্লেন, ইহা খোদায়ী সৈন্য, আমাদের সাহায্যার্থে এসেছে। কতক লোক এ ফিরিশ্‌তাদের দেখেছেনও। উতবা, শায়বা ও আবূ জাহল তো আগেই ভূপতিত হয়েছিলো। এখন মুসলমানদের প্রবল আক্রমণ ও ধূলি-ঝড়ের কারণে তাদের পা তিষ্ঠিতে পারলো না তারা পলায়ন করতে আরম্ভ করলো। শত্রু সৈন্য সত্তর জন নিহত হলো আর এমনি সংখ্যক বন্দী হলো। আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদকে আবূ জাহলের খোঁজে পাঠানো হলো। হযরত আব্দুল্লাহ্ গিয়ে তাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আবূ জাহল ? সে বল্লো, তোমরা কি আমার চেয়ে সম্ভ্রান্ত আর কাউকে হত্যা করেছো ? পরে সে মৃদু কণ্ঠে বল্লো, ভাগ্য ভাল আমি চাষাদের হাতে (অর্থাৎ মদীনার আনসারগণ। তারা চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন) মারা যাই নি (বুখারী)। অতঃপর সে জানতে চাইলো, মাঠ কাদের দখলে ? হযরত আব্দুল্লাহ্ বল্লেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সঃ)-এর। পরে আবূ জাহল নিশ্চুপ হয়ে গেল। তার ভবলীলা এভাবে সাঙ্গ হলো (*যুরকানী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪২৮ ইবনে উকবার বরাতে*)। এর পরে হযরত আব্দুল্লাহ্ এসে হুযূর (সঃ)-কে এই খবর দিলেন। (চলবে)।

(হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ, (রাঃ)-এর 'সীরাতে খাতামান্নবীঈন' পুস্তকাবলম্বনে)

- মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

কাদিয়ান-দারুল আমান

কাদিয়ানের ইতিহাস

আব্দুর রশিদ আর্কিটেক্ট, চেয়ারম্যান
ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েসন অব আহমদী আর্কিটেক্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ার্স

(৩০-০৬-৯৯ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

অন্যান্য পবিত্র স্থানসমূহ

মেহমানখানা

বস্তুতঃ মেহমানখানার (অতিথিশালার) ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল প্রতিশ্রুত মসীহের গৃহ দারুল মসীহ্ হতেই। প্রতিশ্রুত মসীহ্ তাঁর মোবারক হস্তে এর ভিত্তি স্থাপন করেন। প্রতিকূল অবস্থা ও আর্থিক সংকট সত্ত্বেও তিনি নির্দ্বিধায় আনন্দের সাথে ও ভদ্রজনোচিতভাবে এ দায়িত্ব পালন করেন। মেহমানগণকে এরূপ উচ্চমানের সেবা দেয়া ও তাদের জন্যে থাকার জায়গা ও খাদ্যের ব্যবস্থা করা আল্লাহ্‌র প্রেরিত ব্যক্তি ও নবী ছাড়া কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। দারুল মসীহ্ থেকেই পাকানো খাদ্য আসতো। কিন্তু যখন আগন্তুক ও মেহমানের সংখ্যা বেড়ে গেল তখন একাধিক মহিলা কর্তৃক চাপাতি তৈরী হতে থাকলো। আগন্তুক ও মেহমানের সংখ্যা যখন আরো বেড়ে গেল তখন চাপাতি তৈরীর জন্যে একটি তন্দুর ও চুল্লি বসানো হলো। তরকারী হিসেবে একবেলা ডাল ও অন্যবেলা শাক-সব্জীর ব্যবস্থা করা হতো। ডাল এতই সুস্বাদু হতো যে, মেহমানগণ তা স্যুপের ন্যায় পান করে ফেলতেন।

কোন কোন সময় প্রতিশ্রুত মসীহ্ তাঁর নিজ পবিত্র হাতে মেহমানগণকে সকালের নাস্তা ও রাতের খাবার পরিবেশন করতেন। মাঝে মাঝে এমনও হতো যে, তাঁকে খাবার ঘাটতি হয়েছে বলে জানানো হতো। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি মেহমানগণের জন্যে নিজ খাবার পাঠিয়ে দিতেন। সকালের নাস্তা গোল কামরায় ও রাতের খাবার মসজিদে মোবারকের ছাদে পরিবেশন করা হতো। কিন্তু শীতকালে মসজিদের ভিতরেই রাতের খাবার পরিবেশন করা হতো। শুরুর দিকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ মেহমানগণের সাথে খেতেন। হুযূর (আঃ) অত্যন্ত কম খেতেন। তাঁর জন্যে যদি বিশেষ কোন খাবার তৈরী করা হতো তিনি তা মেহমানগণের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। এ ব্যবস্থা কয়েক বছর যাবৎ জারী ছিল। কিন্তু যখন এরূপ বিরাট সংখ্যক লোককে বসতবাড়ীতে খাওয়ানো ও থাকার ব্যবস্থা করা অসম্ভব হয়ে পড়লো এবং চাহিদা বেড়েই চললো তখন বর্তমান মেহমানখানার ব্যবস্থা চালু হলো।

বেহেশ্‌তী মাকবেরা (স্বর্গীয় কবরস্থান)

"একটি স্বপ্নে আমাকে কবরস্থান দেখানো হলো। খোদা ইহার নাম রাখেন বেহেশ্‌তী মাকবেরা। অতঃপর ওহীর মাধ্যমে আমাকে জানানো হলো যে, সমগ্র ভারত উপমহাদেশে এ কবরস্থানের সাথে তুলনীয় কোন কবরস্থান নেই। এ কবরস্থান যেভাবে আশীষমন্ডিত হয়েছে অন্য কোন কবরস্থান তদ্রূপ আশীষমন্ডিত হয় নি"।

ঐশী নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মসীহ্ জামাতের পুণ্যবান লোকগণকে দাফন করার জন্যে একটি কবরস্থান তৈরী করেন এবং ইহার নাম রাখেন বেহেশ্‌তী মাকবেরা। এ বিশেষস্থানে সমাহিত হওয়ার জন্যে শর্ত রাখা হয় যে, মৃত ব্যক্তিকে কেবলমাত্র অতি উচ্চ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হলেই চলবে না, তাকে ন্যূনপক্ষে বাৎসরিক আয়ের দশভাগের একভাগ ও তার স্থাবর সম্পত্তির দশভাগের একভাগ কুরবানী করতে হবে। এতদ্ব্যতীত তাকে ইসলামের সেবায় বড় বড় কাজ করার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। অনেক দোয়ার পর প্রতিশ্রুত মসীহ্ এ কবরস্থান সম্পর্কে নিম্নোক্ত ওহী লাভ করেন : "এ কবরস্থানে খোদার সর্বপ্রকারের আশীষ বর্ষিত হবে"।

বাটালার পবিত্র স্থানসমূহ

হযরত ভাই আব্দুর রহমান কাদিয়ানী (প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র সাহাবী) ১৯৫৩ সালের ৩০শে জুলাই ৯১ জন লোককে নিয়ে পবিত্র স্থানসমূহ দেখানোর জন্যে বাটালায় গেলেন।

বাটালা রেলওয়ে ষ্টেশনের প্লাটফরম

পূর্বদিকস্থ পানির পাম্প (যেখান থেকে ট্রেনের ইঞ্জিন পানি নেয়)-এর প্রায় ৫০ফুট পশ্চিম দিকে অবস্থিত আপার প্লাটফরমের পূর্বাংশ হচ্ছে সেই স্থান যেখানে বাক্সে রক্ষিত প্রতিশ্রুত মসীহের মরদেহ লাহোর থেকে আগত ট্রেন হতে নামিয়ে রাখা হয়েছিল। রাত্র সাড়ে এগারটার সময় বাক্সটি ট্রেন হতে নামানো হয়েছিল এবং তা রাত্র সাড়ে বারটা পর্যন্ত এক ঘন্টা যাবৎ এ প্লাটফরমে রাখা হয়েছিল।

আম গাছ

শবদেহ ধারণকারী বাক্সটি প্লাটফরম থেকে সরিয়ে প্রায় দুঘন্টা যাবৎ এ বৃক্ষের নীচে রাখা হয়েছিল। আম গাছটি রাস্তার পশ্চিম দিকে অবস্থিত রেল স্টেশনের বাইরে ছিল। সেখান থেকে শবদেহ ধারণকারী বাক্সটি উঠিয়ে একটি চারপাইতে রাখা হলো। অতঃপর প্রতিশ্রুত মসীহের শীষ্যগণ চারপাইটি তাঁদের কাঁধে উঠিয়ে কাদিয়ান নিয়ে গেলেন। এ স্থানটি হযরত ভাইজী ও ডক্টর আতার দীন সনাক্ত করেন। এঁরা প্রতিশ্রুত মসীহের সাহাবী ছিলেন এবং ১৯০৮ সালে শবদেহের সাথে ছিলেন। যে প্রতিনিধি দলটি শবদেহ ধারণকারী বাক্সটি বহন করছিলেন তাঁদের সাথে উম্মুল মু'মিনীনও ছিলেন। তাঁরা ১৯০৮ সালের ২৭ শে মে সকাল সাড়ে নয়টায় কাদিয়ান পৌছলেন।

ম্যাডাম ইছরা দেবীর অতিথিশালা

এ অতিথিশালাটি রেললাইন সংলগ্ন বাটালার রাস্তায় অবস্থিত। ইহা রাস্তার পূর্ব দিকে অবস্থিত রয়েল ফাউন্ড্রীর নিকটে। এ অতিথিশালার প্রবেশ পথে লেখা আছে যে, ১৮৯৩ সালের ১৫ই আগষ্টে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। অতিথিশালার ফটক রাস্তার পশ্চিম দিকে। ফটকে প্রবেশ করার পর বামদিকে একটি সিঁড়ি আছে, যা দিয়ে উপরের তলায় যাওয়া যায়। এ সিঁড়িটি তিনতলায় একটি কক্ষের সম্মুখে গিয়ে শেষ হয়েছে। ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে লাহোর রওনা হওয়ার প্রাক্কালে প্রতিশ্রুত মসীহ্ শেষ বারের মত কক্ষটিতেই অবস্থান করেছিলেন। এ কক্ষটি এখনো সেখানেই আছে। এর কোন পরিবর্তন হয় নি। ইহা প্রায় ৯.১১ ফুট বাই ৭.১১ ফুট। প্রতিশ্রুত মসীহের সাথে ১০ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ছিলেন। এর মধ্যে ৭ জন ছিলেন তাঁর পরিবারের এবং বাকী ৩ জন ছিলেন খাদেম।

বাটালার জেলখানা

এ জেলখানার এক তালা ঠিক পূর্বের ন্যায় আছে। দোতালায় নূতন কক্ষ

বসানো হয়েছে। হযরত ভাইজী বলেন, প্রতিশ্রুত মসীহ্ এ গৃহেও অবস্থান করতেন। অবশ্য তাঁর এ অবস্থান ছিল ১৮৯৫ সালের পূর্বে। হযরত ভাইজী কাদীয়ানে আসেন ১৮৯৫ সালে। হযরত ভাইজী আরো বলেন, ঠিকাদার মুহাম্মদ আকবর জেলখানার দক্ষিণ দিকে থাকতেন। মুহাম্মদ বক্স (যিনি মার্টিন ক্লার্কের মোকদ্দমায় মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন যে চাদরে বসেছিলেন তিনিনিজের সেই চাদরটি টেনে সরিয়ে ফেলেছিলেন) উক্ত মুহাম্মদ আকবরের ভাই ছিলেন। ঠিকাদার আল্লাহ্ ইয়ারও তার তৃতীয় ভাই ছিলেন।

চক (স্কয়ার)

এই চকটি মিঃ আর এম বাটালার আদলতের বড় ফটকের উল্টো দিকে অবস্থিত। ইহাই সে স্থান যেখানে মার্টিন ক্লার্কের মোকদ্দমার শুনানীর দিন প্রতিশ্রুত মসীহের হাতে হাতকড়া লাগানো অবস্থায় দেখার আশা নিয়ে মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী তার দলবল নিয়ে চুপিসারে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ স্মিতহাস্যে ঘোড়ার গাড়ী থেকে নামছেন এবং কানপুর জামাত তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা দিল তখন তিনি অত্যন্ত বিরক্তির সাথে তার দলবল নিয়ে ঐ স্থান ত্যাগ করলেন।

মিলিটারী অতিথিশালা

ইহা ঐ অতিথিশালা যার এক অংশ রেসিডেন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত।প্রতিশ্রুত মসীহ্ আদালতের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত কক্ষের ছাদে এক রাত কাটিয়েছিলেন, কারণ ম্যাজিষ্ট্রেট শুনানীর তারিখ পরিবর্তন করে পরবর্তী দিন ধার্য করেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের নাম ছিল ক্যাপ্টেন ডগলাস ইয়ং।

ডিষ্ট্রিকট বোর্ড রেষ্ট হাউস

ইহা ঐ দালান যেখানে মার্টিন ক্লার্ক কর্তৃক রুজুকৃত মামলায় প্রতিশ্রুত মসীহ্ দু'দিন উপস্থিত হয়েছিলেন। গুরুদাসপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটও এই রেষ্ট হাউসে বাস করছিলেন। রেষ্ট হাউসের পূর্বদিকে খোলা জায়গায় পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট তার কর্মচারীগণসহ তাবুতে ছিলেন। প্রতিশ্রুত মসীহ্ বাটালায় পৌছে তাঁর খাদেমগণসহ মোজা রেষ্ট হাউসে চলে গেলেন, যেখানে শুনানী হওয়া নির্ধারিত ছিল। পাদরী মার্টিন ক্লার্ক ইতোমধ্যে ভিতরে ছিলেন। রেষ্ট হাউসের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত কক্ষটিকে আদালত কক্ষরূপে ব্যবহার করা হচ্ছিল। ইহার উত্তর ও পশ্চিমদিকে দু'টি বারান্দা ছিল। এ কক্ষটি এখনো বিদ্যমান আছে। হযরত ভাইজী বলেন, মিষ্টার ডগলাস ইয়ং একটি লম্বা টেবিলের পিছনে পূর্বদিকে মুখ করে এ কক্ষে এসেছিলেন। টেবিলের পশ্চিম দিকে দু'টি চেয়ার ছিল। একটি ছিল তাঁর বায়ে এবং অন্যটি ছিল তাঁর ডানে। ইতোমধ্যেই তাঁর বামদিকের চেয়ারে পাদ্রী মার্টিন ক্লার্ক বসাছিলেন এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্কে তাঁর ডান দিকের চেয়ারে বসতে দিলেন।

প্রথমে জনাব আব্দুল হামীদ সাক্ষীরূপে উপস্থিত হলেন। অতঃপর মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভীকে ডাকা হলো। যখন তিনি দেখলেন প্রতিশ্রুত মসীহ্ একটি চেয়ারে বসে আছেন তিনি ক্রোধান্বিত হলেন এবং একটি চেয়ারও চাইলেন। প্রথমে ম্যাজিষ্ট্রেট কোন উত্তর দেন নি। কিন্তু যখন মৌলভী সাহেব বারবার চেয়ার চাইতে লাগলেন তখন ম্যাজিষ্ট্রেট অত্যন্ত কঠোর ও ক্রুদ্ধ ভাষায় তাকে চুপ হয়ে যেতে বল্লেন এবং তাকে সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে আদেশ দিলেন। এরপর মৌলভী সাহেব তার সাক্ষ্য শেষ করে আদালত কক্ষ ত্যাগ করলেন। আদালত কক্ষের বাইরে খিলানের নীচে উত্তর বারান্দায় মুহাম্মদ বক্স নামে একজন মুসলিম ভ্রাতা মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে রেখেছিলেন। মৌলভী সাহেব নিজকে শান্ত করার জন্যে এই মাদুরে বসে পড়লেন। যখন মুহাম্মদ বক্স এটা দেখলেন তিনি মৌলভী সাহেবকে সরিয়ে দিয়ে মাদুরটি গুটিয়ে ফেল্লেন। তিনি বল্লেন, "মৌলভী সরে পড়, আমার মাদুর অপবিত্র করো না। তুমি একজন খৃষ্টানের পক্ষ নিয়ে একজন মুসলমানের বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ দিতে এসেছ !" এখানে লাঞ্ছিত হওয়ার পর তিনি সরে গিয়ে একটি চেয়ারে বস্লেন। এই চেয়ারটির মালিক ছিল পুলিশ ক্যাম্পের নিকটস্থ একজন পিয়নের। পিয়ন দেখেছিল যে, এই মৌলভী আদালত কক্ষে চেয়ার চেয়ে কটু কথা শুনে এসেছে। তখন সে-ও মৌলভী সাহেবকে তার চেয়ার খালি করে দিতে বল্লো এবং চেয়ারটি সরিয়ে নিয়ে গেল।

হুযূরের ইলহাম "যে তোমাকে অপমানিত করার ইচ্ছা পোষণ করবে আমি তাঁকে লাঞ্ছিত করবো" অনুযায়ী লাঞ্ছিত হওয়ার দৃশ্য মৌলভী সাহেব দেখে নিলেন। ঐ দিন হুযূর আকদ্স আদালত কক্ষে প্রায় দেড়ঘন্টা বসে রইলেন। হুযূরের পক্ষ থেকে উকিল ছিলেন লাহোরের মৌলভী ফযল দীন সাহেব। অতঃপর মোকদ্দমা পরের দিনে মুলতবী করে দেয়া হয় এবং পুলিশের মাধ্যমে আব্দুল হামীদকে সত্য সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে বলা হয়। বস্তুতঃ আব্দুল হামীদ পরের দিন তার সাক্ষ্য দিল। সে হুযূর আকদসের নির্দোষ হওয়ার কথা স্বীকার করলো এবং পাদরী মার্টিন ক্লার্কের মিথ্যাবাদিতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিল। এই ঘটনা ১৮৯৭ সালের। পরের দিন হুযূর আকদ্সকে বেকসুর খালাস হওয়ার সংবাদ জানানো হলো।*(ক্রমশঃ)*

নিজ কর্তব্যের অংশ হিসেব *"প্রত্যেক সন্ধ্যায় যাওয়ার পূর্বে আত্ম-জিজ্ঞাসা করে দেখ ঐ দিন আল্লাহ্র বাণী পৌছানোর জন্যে কতখানি প্রচেষ্টা করেছ" [খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)]*

চশমায়ে যমযম

(যমযমের প্রস্রবণ)

বুশরা দাউদ

(একটি ওয়াকফে নও পাঠ্য-পুস্তক)

বংশ পরিচয়

প্রিয় নানাজান ছিলেন হযরত হাকীম আব্দুল সামাদ সাহেব দেহেলভী। তিনি মোঘল পরিবারের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ্ জাফরের রাজকীয় ঔষধালয়ের ব্যবস্থাপক মোকাররম হাফীয মুহাম্মদ বুলাকী সাহেবের পৌত্র।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে ১৯০৫ সনে যখন দিল্লীতে গিয়েছিলেন তখন তাঁকে প্রথমবার দেখেন। তিনি বলেছেন, "যখন আমার দৃষ্টি হযরত আকদসের পবিত্র মুখমন্ডলের ওপরে পড়লো তখন পা কাঁপতে আরম্ভ করলো। মন বল্লো, মিথ্যেবাদীর মুখমন্ডল এমন নয়। আর আমি সব সময়ের জন্যে আপনার হয়ে যাচ্ছি"।

তিনি সারা জীবন ধর্মের প্রচারের ও খোদার সৃষ্টির সেবায় কাটিয়ে দেন। প্রিয় নানীজান হযরত শাদমানী বেগম সাহেবা তাঁর পিতা হযরত দারোগা আব্দুল হামীদ সাহেব সাহাবী (রাঃ) আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতার নিকট বয়াতের পত্র লিখেন। তিনি লিখতে জানতেন না। এজন্যে তাঁর মামাতো

ভাই মোকাররম মুন্সী আবিদ হুসায়েন সাহেব হাত ধরে দস্তখত করান। তাঁর বয়স ছিলো ৬ বছর। তিনি খুবই সাদা-সিদা স্বভাবের লোক ছিলেন। ধর্মানুরাগী ছিলেন। যুবক বয়সেই ইন্তেকাল করেন। কাদিয়ানের বেহেশ্‌তি মকবেরায় সমাহিত আছেন।

আল্লাহ্‌তাআলা এ উভয় বুযর্গকে স্বীয় করুণার ছায়ায়ে স্থান দিন। তথাস্তু! হে সমগ্র জগতের প্রভু-প্রতিপালক।

বুশরা দাউদ

১৪/৪/১৯৮৭ পিতা মির্যা আব্দুর রহীম বেগ সাহেব

পুস্তক পরিচিতি

বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা বিশ্ব সৃষ্টির সময়ে সৃষ্টির উদ্দেশ্য হযরত বিশ্ব নেতা মুহাম্মদ আরবী সল্লাল্লাহ্ আলায়হে ওয়া সল্লামের আর্বিভাবের নিদর্শনাবলীও বিশ্বের পর্দায় অংকিত করে দিয়েছেন। এসব নিদর্শনাবলী ঐ কথার সাক্ষী যে, এক অনুগ্রহশীল পরিপূর্ণ নবী (সঃ) তাঁর মর্যাদাকে পূর্ণ প্রতাপের সাথে প্রকাশ করতে এসব পার্থিব ও অপার্থিব নিদর্শনাবলীকে আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভের চিহ্ন হিসেবে নির্দেশ করেছেন। যমযমের প্রস্রবণও এগুলোর অন্যতম।

হযরত রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সল্লামের পিতৃপুরুষ হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে প্রস্রবণের স্ফুটন একটি নতুন আধ্যাত্মিক ধারার শুভ সংবাদ বহন করে। তাঁর (সঃ) আবির্ভাবের পূর্বে ১ লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী (আঃ) পিপাসার্ত মানবতাকে তৌহীদ (একত্ববাদ)-এর স্বচ্ছ প্রস্রবণের কল্যাণরাশি দ্বারা সিঞ্চিত করেছিলেন।

কিন্তু কাল প্রবাহের আবর্তন-বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র শিক্ষাসমূহ বিলীন হয়ে যায়। আর নবী (সঃ)-এর আবির্ভাবের সময়ে ইহুদীবাদের প্রস্রবণ শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল। খৃষ্টবাদের কূয়োর পানি পৃথিবীর বক্ষস্থলে নেমে গিয়েছিল। মাজূসী ও সাবী ব্যক্তিবর্গের জলাধার নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো। অধার্মিকতা সর্বত্র ছেয়ে গিয়েছিলো (সমস্ত কল্যাণকে গ্রাস করেছিলো)।

এ দীর্ঘ নিদর্শনাবলীর বিশ্বে ঐশী বারিধারা বর্ষণের সুসংবাদের আস্বাদপূর্ণ যমযমের প্রস্রবণ দ্বিতীয়বার প্রবহমান হয়। ইহা ঐ কথার প্রমাণ ছিলো যে, পৃথিবীর আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবৃত্তকারী আধ্যাত্মিক প্রস্রবণ হলো মুহাম্মদী (সঃ) প্রস্রবণ। ইহা পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত বিরাজমান থাকবে এবং সাধারণ ও অসাধারণ প্রত্যেক ব্যক্তির অবগাহনের নিমিত্তে প্রবাহিত হতে থাকবে।

হে সমগ্র জগতের প্রভু-প্রতিপালক ! তুমি বর্তমান কালের মানুষকেও, যারা পিপাসার কষ্টে কাতর এবং আকাশের দিকে আশা ভরা দৃষ্টি নিয়ে বসে আছে এ মুহাম্মদী (সঃ) প্রস্রবণ দ্বারা পরিতৃপ্ত হওয়ার সৌভাগ্য দান করো।

আমার খোদা ! এ লেখাকে গ্রহণ করো আর আমার আকাঙ্ক্ষার পিপাসা তোমার প্রিয় নবী (সঃ)-এর সন্নিধানে পাঠাও। তথাস্তু, হে সমগ্র জগতের প্রভু-প্রতিপালক !

দোয়া প্রার্থী

বুশরা দাউদ

দু'টি কথা

শতবার্ষিকী কৃতজ্ঞতা উৎসবের প্রেক্ষাপটে করাচী জিলার সেক্রেটারী ইসলাহ ও ইরশাদ বুশরা দাউদ সাহেবা ছোট ছোট শিশুদের জন্যে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সল্লামের বিষয়ে ছোট ছোট হৃদয়গ্রাহী পুস্তিকা প্রণয়ন করেছেন। ইহা তাঁর খুবই সাধু প্রচেষ্টা। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমি এ পুস্তিকাখানা- চশমায়ে যমযম শুরু থেকে শেষ অব্দি পাঠ করেছি। শিশু-বৃদ্ধ সকলের জন্যে পুস্তিকাতে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। ইহা কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত। আমি আশা রাখি যে, বোনেরা ও বালিকারা এথেকে উপকৃত হবেন।

আমার দোয়া এই যে, আমরা এরূপ লেখা পাঠ করে এর শিক্ষণীয় বিষয়সমূহকে নিজেদের পরিবেশে কার্যকরী করি এবং সুন্দর সুন্দর ফলের জন্যে দোয়া প্রার্থী হই।

ওয়াস্‌সালাম

সলীমা মীর

সদর, লাজনা ইমাইল্লাহ্, করাচী জিলা

চশমায়ে যমযম

প্রিয় শিশুরা ! আজ আমি তোমাদেরকে এমন একটি প্রস্রবণ সম্বন্ধে বলছি যা কেবলই খোদার ইচ্ছেনুযায়ী তাঁর প্রিয় লোকদের জন্যে অস্তিত্বলাভ করেছিলো।

চশমাহ্ (প্রস্রবণ বা ঝর্ণা) পানির ঐ ভান্ডারকে বলা হয় যা পৃথিবীর বক্ষস্থল বিদীর্ণ করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রবাহিত হয়। ইহাকে কূয়োর ন্যায় খনন করে তৈরী করা হয় না। বরং স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রবাহিত হয়ে থাকে। চশমাহ্ দু'প্রকার হয়ে থাকে ঃ

(১) গরম পানির (২) ঠান্ডা পানির

এই চশমাহ্ ছিলো ঠান্ডা পানির। ইহাকে বলা হয় 'যমযম'। 'যমযম' অর্থ হলো থাম থাম অর্থাৎ থেমে যা থেমে যা (আনন্দ উৎসবে যে গান গাওয়া হয় তাকেও যমযম বলা হয়)। এ চশমা মক্কা উপত্যকায় অবস্থিত। এ চশমাহ্-এর কারণেই মক্কার আবাদ হয়েছে। মক্কা মরুভূমি অঞ্চল। মরুভূমিতে পানি থাকে না। ভূমি বালুকাময় হওয়ার কারণে যদি বৃষ্টি হয়েও যায় তাহলে তা তৎক্ষণাৎ শুষে যায়। এজন্যে মরুভূমিতে ঝিল বিল বা পুকুর পাওয়া যায় না। অনেক দূর পর্যন্ত পানির নাম গন্ধও পাওয়া যায় না। যদি একটি কাফেলা বা দলও মরুভূমিতে পথ হারিয়ে ফেলে তাহলে তা পানির পিপাসায় ছট্ ফট্ করতে করতে মারা যায়। পানি যেহেতু মানব জীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষ এজন্যে মানুষ ঝর্ণা-নদী ও ঝিলের তীরে বসবাস করা পসন্দ করে থাকে। আর যেখানে পানি না থাকে সেখানে কোন মানুষ বসবাস করে না।

পানি না থাকার কারণে মক্কাও অনাবাদি ছিলো। ইহা ছিলো জন-মানবহীন পরিত্যক্ত স্থান। এর বিখ্যাত পাহাড় হলো সাফা ও মারওয়া। এর নিকটে এই প্রস্রবণ অবস্থিত।

প্রিয় শিশুরা ! খোদা কি করলেন জানো ? তিনি স্বীয় প্রিয় বান্দা হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে আদেশ দিলেন, তোমার বড় পুত্র ইসমাঈলকে তার মা হাজেরাসহ ঐ অনাবাদি স্থানে ছেড়ে আসো !

আল্লাহ্‌তাআলার সাথে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিলো। তিনি কিছু খাবার দাবার ও এক মশক পানি নিলেন। হযরত হাজেরার কোলে হযরত ইসমাঈলকে দিলেন এবং রওয়ানা দিলেন। এক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পরে তিনি খাবার-দাবার মাটিতে রাখলেন এবং ফিরে চল্লেন।

হযরত হাজেরা খুবই বিচলিত হলেন। চিন্তা করতে লাগলেন যে, ঝগড়া-বিবাদও হয় নি। আমার প্রতি অসন্তুষ্টও হন নি। শিশুকেও নিবিড়ভাবে ভালবাসেন। তাহলে পরে এর কারণ কী ? তখনও হযরত হাজেরা ঐ চিন্তায়ই বিভোর ছিলেন। যখন দেখতে পেলেন যে তাঁর স্বামী হযরত ইব্‌রাহীম ফিরে যাচ্ছেন তখন হযরত হাজেরা খুবই বিচলিত হলেন। খুব ক্ষিপ্র গতিতে তাঁর পিছু পিছু যেতে থাকলেন এবং সাথে সাথে বলতে থাকলেন, আমি কী অপরাধ করেছি ? আপনি কি অসন্তুষ্ট যে, আমাদের এ জন-মানবহীন স্থানে ছেড়ে যাচ্ছেন ?

হে শিশুরা ! ওদিকে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এরও ঐ একই অবস্থা। তিনি দুঃখ-বেদনার জবাব দিতে পারছিলেন না। কেননা, গভীর দুঃখের কারণে তাঁর বাক্ শক্তি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। তিনি খুবই ধৈর্য-ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আকাশের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করলেন। এরপরে ঐ পুণ্যবতী মহিলা বুঝে গেলেন যে, ইহা খোদাতাআলার আদেশে পালিত হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বল্লেন, যদি খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে আপনি আমাদের ছেড়ে গিয়ে থাকেন তাহলে পরে চিন্তা করবেন না। তিনি আমাদের কখনও বিনষ্ট করবেন না। আপনি নিশ্চিন্তে যান। *

হাজেরাও আল্লাহ্‌তাআলাকে খুবই ভালবাসতেন। তিনি আল্লাহ্‌তালার সকল আদেশ পালন করাকে ফরয মনে করতেন। এজন্যে তিনিও এই হৃদয়গ্রাহী জবাব দিলেন। শিশুরা ! চিন্তা করে দেখো ! যেখানে দূরে দূরেও কোন গাছ-পালা থাকে না যার ছায়ায় মানুষ বসতে পারে, আবার মানুষ নেই, এমনকি মানুষের গন্ধও নেই, তাই মনে করো কতটা ভয় লাগতে পারে। কিন্তু যারা খোদাকে ভালবাসেন তাদের কোন ভয় ও ঝুঁকি থাকে না। তাদের প্রাণ থাকে স্বস্তিতে ভরপুর। যদি গাছের ছায়া না থাকে খোদা তো আমাদের সাথে আছেন। সুতরাং ভয় কিসের !

হযরত হাজেরা শিশুকে নিয়ে আকাশের নিচে বসে গেলেন। কিছু সময় পরে খাবার ও পানীয় শেষ হয়ে গেলো। এখনতো শিশু অস্থির করে তুল্লো। পিপাসা তাকে কষ্ট দিচ্ছিলো। প্রথমে তো হযরত হাজেরা শিশুকে এদিকে-সেদিকে নিয়ে সান্ত্বনা দিতে থাকেন। সাথে সাথে এদিক-সেদিক তাকাতেও থাকেন যদি পানি পাওয়া যায়। কিন্তু এক ফোঁটা পানিও পাওয়া গেলো না।

পিপাসার কঠোরতা বাড়তে লাগলো। এর সাথে সাথে শিশুর অবস্থাও খারাপ হতে থাকলো। আবার মা-ও অস্থির হয়ে গেলেন। তিনি শিশুকে মাটিতে শুইয়ে দিলেন এবং দৌড়ে গিয়ে পাহাড়ে উঠলেন। দূরে দূরে তাকাতে থাকলেন যদি কোন পানি পাওয়া যায়।কিন্তু পানি থাকলে তো পাওয়া যাবে। আবার বিচলিত হয়ে নিচে নেমে আসলেন। শিশুকে দেখলেন। সে পানির পিপাসায় কাতর হয়ে পায়ের গোড়ালি দিয়ে মাটিতে আঘাত করছিলো। দৌড়ে গিয়ে দ্বিতীয় পাহাড়ে উঠলেন। দূরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন কিন্তু কোথাও পানির নাম-নিশানাও দেখতে পেলেন না। এভাবে বিচলিত অবস্থায় উভয় পাহাড়েই সাত বার দৌড়া-দৌড়ি করলেন এবং প্রত্যেকবার এসে শিশুটিকে দেখে গেলেন। চক্ষু দিয়ে পানি ঝরছিলো। বারে বারে আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছিলেন আর খোদার সাহায্য কামনা করছিলেন। যখন সপ্তম বারের পাঁক লাগানো শেষ হতে যাচ্ছিলো তখন আকাশ থেকে ফিরিশ্‌তার আহ্বান আসলো, হে হাজেরা ! তোমার হয়েছে কী ? ভয় পেয়ো না। কেননা, খোদা ঐ স্থান থেকে যেখানে শিশুটি পক্ষে ছিলো তার ডাক শুনেছেন। উঠো এবং ছেলেকে উঠাও। তাকে হাতে তুলে নাও। আমি তার মাধ্যমে এক জাতি সৃষ্টি করবো (আদি পুস্তক- অধ্যায় ২১, পদ ১৭-১৮)।

হযরত হাজেরা যখন শিশুর নিকট ফিরে আসলেন তখন দেখেন কী ! শিশু যেখানে পায়ের গোড়ালি দ্বারা মাটিতে আঘাত করতে ছিলো সেখানে মাটি সিক্ত। তিনি সত্বর হাত দিয়ে মাটি অপসারিত করলেন। তখন ফোঁটা ফোঁটা করে পানি বের হতে আরম্ভ করলো। তৎক্ষণাৎ শিশুটিকে পান করালেন। আবার নিজেও দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে পরিশ্রান্ত ছিলেন। পানি পান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে খোদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকলেন এই বলে, যে, প্রকৃতই তুমি মহান সত্তা তাঁর প্রাণ খোদার প্রশংসায় ভরপুর হয়ে গেলো। কখনও তিনি শিশুকে দেখেন আবার কখনও পানি বের হওয়া দেখেন। তাঁর চোখ থেকে পানি ঝরছিলো ইহা সম্ভবতঃ খোদার প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বয়ে চলেছিলো।

হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন যে, পানি তীব্র বেগে বের হচ্ছে। তখন অবলীলায় তাঁর মুখ থেকে বের হলো 'যমযম' 'যমযম' অর্থাৎ থেমে থেমে। এর অর্থ ছিলো থেমে যা থেমে যা এবং সাথে সাথে আশে-পাশের মাটি ও পাথর একত্র করে এর চারিদিকে একটি বাঁধ তৈরী করে দিলেন যেন পানি প্রবাহিত হয়ে অপচয় না হয়। এ কারণে এ পবিত্র চশমাহ্ (প্রস্রবণে)-এর নাম যমযম হয়ে গেলো।

হাদীসে এসেছে যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহ্ আলায়হে ওয়া সল্লাম বলেছেন, খোদা হাজেরার ওপরে করুণা করুন। যদি তিনি পানিকে বাধা না দিতেন তাহলে তা প্রবাহিত প্রস্রবণে পরিণত হতো (সীরাতে খাতামান্নবীঈন, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৩)।

তাহলে শিশুরা শোন ! এ পানি, এ প্রস্রবণ যা কিনা আল্লাহ্‌তাআলার বিশেষ স্নেহ ও ভালবাসার কারণে প্রস্ফুটিত হয়েছে আজও বিশ্বকে এক আহ্বান জানাচ্ছে যে, হে মানবমন্ডলী ! আমার প্রতি তাকাও, আমি ঐসব লোকদের জন্যে একটি নিদর্শন যারা খোদা এবং তাঁর মহিমা ও শক্তি সম্বন্ধে জানে না। আস্, আমার মিস্টি ও ঠান্ডা পানি দ্বারা এই তপ্ত মরুভূমিতে স্বীয় পিপাসা নিবৃত্তি করো। নিশ্চয় তোমাদের আত্মাও সিঞ্চিত ও পরিতৃপ্ত হবে। শিশুরা ! এ প্রস্রবণ মানুষকে বিস্মিত করে দেয়। মরু ভূমিতে তো পানিই পাওয়া যায় না। যদি পানি আসে তাহলে সাথে সাথে মাটি উহা শুষে নেয় আর বলা হয় বালুকাময় ভূমি স্বীয় বক্ষ বিদীর্ণ করে পানি গিলে ফেলেছে। আশ্চর্য বিষয় নয় কি ? এখন অসাধারণ ও অসম্ভব বিষয়কে মু'জেযা ও অলৌকিকত্ব বলে।

এ মু'জেযা এমনিতো হযরত হাজেরা ও হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর পক্ষে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু শিশুরা ! তাদেরকে এখানে আবাদ করার মধ্যে কী উদ্দেশ্য ছিলো ? কেন এ বিরাণ ভূমিতে ডেকে আনা হলো ? এর কারণ আমি বলছি- খোদার এ স্থানে তাঁর সবে, প্রিয় পুত্রকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ছিলো। আর এখন অনাবাদী পানিবিহীন স্থানে তো তার প্রিয় মানুষকে সৃষ্টি করতে পারেন না। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, প্রথমে এ স্থানটি আবাদ হোক। এজন্যে হযরত হাজেরাকে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-সহ এখানে ডেকে আনলেন এবং পানি নির্গত করলেন। এ কথা অবিকল ঐ রকমইযে, যখন কোন মানুষ ছোট থেকে ছোট কাজ করতে চায় তখন প্রথমে উহার জন্যে পরিকল্পনাও তদনুযায়ী হয়ে থাকে। অবিকল এভাবেই খোদা এই প্রস্রবণকে আসলে তাঁর প্রিয় ব্যক্তির নিদর্শন হিসেবে নির্গত করেছেন। আজ এ ভূমি পিপাসার্ত। আমি ইহাকে সিঞ্চিত করছি। কাল যখন ইহা আবাদ হবে এবং এতে বসবাসকারী আধ্যাত্মিক পিপাসায় আক্রান্ত হয়ে কাতর আর্তনাদ করবে। তাদের চরিত্র ও কর্মকান্ড বিনষ্ট হওয়ার কারণে দিক-বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। *(চলবে)

---

*পাদটীকা ঃ [যখন হযরত ইসমাঈল (আঃ) জন্মগ্রহণ করলেন ঐ সময়ে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর বয়স ছিলো ৮৬ বছর। (আদি পুস্তক- ১৬ অধ্যায় ১৬ পদ)। আর এ সন্তান খুবই দোয়ার পরে আল্লাহ্‌তাআলা দান করেছিলেন। এজন্যে তার নাম রাখা হয়েছিলো ইসমাঈল। ইসমাঈল অর্থ হলো খোদা শুনলেন (তফসীরুল কুরআনের ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৬৫)]।

*টীকা- কেননা, পিপাসার মানুষ সাথে সাথে মারা যায় না বরং তখন এই ভূমিতেই আমি এ প্রশ্রবণের ন্যায় একটি আধ্যাত্মিক প্রশ্রবণ প্রবাহিত করবো যার পানি কখনও শুকোবে না। আর যে-ই উহাকে লাভ করবে সদা জীবন লাভ করবে আর প্রশ্রবণ হবে মুহাম্মদ (সঃ) প্রশ্রবণ। আমার প্রিয়ের কল্যাণের অমিয় ধারা। যেন এ প্রশ্রবণ আমাদের প্রিয় নবী (সঃ)-এর মাহাত্ম্য প্রকাশের লক্ষ্যে প্রবহমাণ, তাঁর খাতিরে তাঁর পিতৃ পুরুষগণকে প্রদত্ত হয়েছিলো।

অনুবাদ- মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

ইসলামের বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব

"ইসলাম আল্লাহ্‌তাআলার মনোনীত ধর্ম"(মায়েদা)।

"আমরাই এই যিক্‌র অবতীর্ণ করেছি আমরাই ইহার রক্ষক" (আল হিজর)।"মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই" (সূরা আলে ইমরান)। ইসলাম প্রবর্তক হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন, "মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই, কখনও তারা পরস্পরকে অত্যাচার করবে না, পরস্পরকে সাহায্য করতে বিরত হবে না, ও পরস্পরকে ঘৃণা করবে না, ন্যায়ের আসন হৃদয়ে, কাজেই যার হৃদয় ন্যায়পরায়ণ সে অপর মুসলমানকে ঘৃণা করে না এবং এক মুসলমানের যা কিছু আছে, তার রক্ত, সম্পক্তি ও সুনাম তা অন্য মুসলমানের জন্য হারাম।" হুযূর (সঃ) আরো বলেছেন, "সকল মুসলমান সম্মিলিতভাবে যেন একটি প্রাচীর, যার প্রতিটি অংশ বাকী অংশগুলিকে সুদৃঢ় করে। এমনিভাবে তারা নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত হবে একে অন্যেয় সহায়তায়।"

মানব-দরদী হযরত রসূল করীম (সঃ) সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি স্থাপন করে তাঁর কথা ও কাজের সমন্বয়ে আজীবন প্রাণান্তকর চেষ্টা ও সাধনা করতঃ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে বিদায় হজ্জের ভাষণে তাঁর যে হিতোপদেশ বিধি-বিধান মেনে চলার নির্দেশ দিয়ে গেছেন, সেগুলি প্রতিটি মুসলমান নর-নারীর হৃদয়ে অংকিত করে দৈনন্দিন জীবনে কথা ও কাজের মাধ্যমে পালন করে চলা অবশ্য কর্তব্য। তা না হলে মৌখিক দাবীর কোন মূল্য নেই। বিদায় হজ্জের দিন লক্ষাধিক জনসমাবেশে হযরত রসূল করীম (সঃ) ঘোষণা করলেন, "হে মানবমন্ডলী ! মানুষ সকলেই এক আদমের সন্তান আর আদমের সৃষ্টি মাটি থেকে। এক দেশবাসীর অন্য দেশবাসীর উপর প্রাধান্যের কোন কারণ নেই। জেনে রাখ, নিশ্চয়ই মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই, আর সকল মুসলমানকে নিয়ে এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃ-সমাজ। যদ্যপি কোন কর্তিতনাশা কাফ্রি ক্রীতদাসকেও তোমাদের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়, তোমরা সর্বতোভাবে তার অনুগত হয়ে থাকবে এবং সর্বতোভাবে তার আদেশ মান্য করে চলবে। দেখ, আজিকার হজ্জ দিবস যেমন মহান, এই মাস যেমন মহিমাপূর্ণ এবং মক্কাধামের এই হরম যেমন পবিত্র, প্রত্যেক মুসলমানের ধন-সম্পদ, প্রত্যেক মুসলমানের মান-সম্ভ্রম এবং প্রত্যেক মুসলমানের শোণিত-বিন্দুও তোমাদের জন্যে সেইরূপ মহান ও সেইরূপ পবিত্র। উক্ত বিষয়গুলির পবিত্রতা হানি করা যেমন হারাম, তদ্রূপ কোন মুসলমানের সম্পত্তির, সম্মানের এবং তার প্রাণের ক্ষতি সাধন করাও তোমাদের প্রতি সেইরূপ হারাম-সেইরূপ মহাপাপ।"

বিশ্ব-মুসলমানের আজ নেই কোন নেতা, নেই একতা, নেই ভ্রাতৃত্ব, নেই শৃংখলা। যে মুসলমান একজন আরেক জনের ভাই, তারাই আজ শতধা বিভক্ত হয়ে একদল আরেক দলের বিরুদ্ধে শাণিত খড়্গ হস্তে পরস্পর শত্রুরূপে পরিণত। আলেমে আলেমে মিল মহব্বত নেই। পীরে পীরে মিল নেই, সর্বত্র হিংসা-বিদ্বেষ। এমনিভাবে মুসলমান জাতি সে আজ আত্মিক-নৈতিক সকল দিক দিয়ে অধঃপাতের শেষ সীমায় এসে সকল জাতির কাছে অবহেলিত অপমানিত. লাঞ্ছিত। একথা আর নতুন করে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন রাখে না। কিন্তু কেন এই অধঃপতন ? আল্লাহ্ ও হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর নির্দেশকে অমান্য ও অস্বীকার করার কারণে নয় কি ? বর্তমান বিশ্বে চল্লিশটির উর্দ্ধে মুসলিম রাষ্ট্র। তাদের মধ্যে নেই একতা, নেই শৃংখলা, নেই ভ্রাতৃত্ববোধ, নেই পরস্পর সহানুভূতি। ইসলাম বিশ্ব-জনীন ধর্ম। ইসলামের অনুসারী মুসলমান জাতির বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বকে অটুট রাখার জন্য অবশ্যই একজন নেতার অত্যাবশ্যক। তাই হযরত রসূল করীম (সঃ) একজন নেতাকে মেনে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে একতাবদ্ধভাবে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বকে বজায় রেখে চলার জন্য কঠোর নির্দেশ দিয়ে গেছেন, যদ্যপি সেই নেতা কাফ্রী ক্রীতদাসও হয়। প্রশ্ন হতে পারে যে, সেই নেতা কে বা কীরূপে হবেন ? গণভোটের মাধ্যমে অথবা অন্য কোন উপায়ে ?

আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, "আমরাই এই যিক্‌র অবতীর্ণ করেছি আমরাই ইহার রক্ষক" (আল্ হিজর) আল্লাহ্‌তাআলার এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বুঝা গেল যে, স্বয়ং আল্লাহ্‌তালাই সেই নেতা মনোনীত করবেন। তজ্জন্য মানুষের মতামতের কোন প্রয়োজন নেই। তিনি কেন এইরূপ করলেন, এনিয়ে মানুষের নাক গলানোরও প্রয়োজন নেই। কিন্তু মানুষ জিজ্ঞাসিত হবে কেন তারা তাঁর আদেশ পালন করলো না। ইসলামের আলেম-ওলামা ও মুফতী সাহেবগণ তাদের বিভিন্ন বই-পুস্তকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ইসলামের বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে খুবই গর্বের সাথে পঞ্চমুখে বর্ণনা করতঃ আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। একজন ইমাম বা নেতার আবশ্যকতাও স্বীকার করেন। কিন্তু বাস্তবে আমল করেন না, অমান্য ও অস্বীকার করেন। যেমন, "হযরত আখেরী নবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্বল্প স্বল্প সংস্কারের দ্বার আবশ্যকবোধে বন্ধ করেন নাই, কেননা, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর প্রারম্ভে এমন ব্যক্তিকে প্রেরণ করিবেন যিনি তাহাদের জন্য তাহাদের ধর্ম সংস্কার করিতে পারেন।" ইসলাম সৌধের উপর শতাব্দী কালের রথচক্রে যে সকল আবর্জনা রাশি পতিত হইয়া যায়, এবং তাহাতে নবীগণরূপ অম্লান, ধবল, শুভ্র খন্ডের জ্যোতিকে দুনিয়া আলোকিত করিবার জন্য আবদ্ধ করিয়া রাখে, তাহাই দুরীভূত করিয়া যাহাতে ইসলাম সৌধের জ্যোতিঃ পুনরায় ধরাকে প্লাবিত করিতে পারে – ইহাই প্রত্যেক মোজাদ্দেদ বা ধর্ম সংস্কারের কর্তব্য। ধর্মে কুরআন ও হাদীসের যে সকল শিক্ষা কালের কবলে পতিত হইয়া বিস্মৃতির সাগরে নিমজ্জিত হইয়া যায় বা সে সকল ভুল-ভ্রান্তি ও কুসংস্কার জড়িত রীতি-নীতি ধর্ম বলিয়া কুখ্যাত হয়, তাহা দুরীভূত করা মোজাদ্দেদের কর্তব্য। উপরন্তু তিনি ধর্মের বিমল জ্যোতিকে বিচ্ছুরিত করিয়া জগদ্বাসীকে সত্য ধর্মের দিকে আকর্ষণ করিবেন ইহাও তাঁহার একান্ত কর্তব্য" (আল্‌হাজ্জ মাওলানা ফজলুল করীম এম, এ, বি, এল রচিত মানব ধর্ম পৃঃ ৮৪-৮৫)। সংস্কারক বা মুজাদ্দিদগণের উপর কর্তব্য পাপরাশির মেঘাবরণ অপসারণ করিয়া ইসলামের মূল শিক্ষার জ্যোতিকে জাতির শিরায় শিরায় বিকীর্ণ করা এবং লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করা (ঐ ৮৬ পৃঃ)। প্রশ্ন এই যে, বর্তমান যুগের মুজাদ্দিদ কে এবং তিনি কোথায় ? নায়েবে রসূলের দাবীদার মাওলানা মৌলবী ও মুফতী সাহেবগণ তার খবর রাখেন কি ? আল্লাহ্‌র প্রেরিত যমানার মুজাদ্দিদ এসে যখন ধর্মের নামে দু'জাহানের অশেষ পুণ্য হাসিলের নামে পীর পুজা, কবর পুজা ইত্যাদি শির্‌ক বি'দাত যেগুলি কিনা মহাপুণ্যের নামে মানুষের রক্ত-মাংসে মজ্জাগত বিশ্বাসে পরিণত হয়ে গেছে, সেগুলিকে মিটাবার চেষ্টা করবেন তখন আলেম-ওলামা ও মুফতী সাহেবগণ ধর্ম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বলে তার বিরুদ্ধাচরণে উঠে পড়ে লাগবেন নাকি ? বর্তমান যুগে আমরা কী দেখছি ? ইসলামের বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই একথা শুধু কেতাবেই লিখা আছে এবং মুখের বুলি ছাড়া বাস্তবে তার উল্টোটাই পালিত হচ্ছে।

এই অবস্থায় আল্লাহ্‌তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে চৌদ্দশত শতাব্দীর মুজাদ্দিদ এবং আখেরী যমানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)রূপে আবির্ভূত করলেন। তিনি আল্লাহ্‌তাআলা কর্তৃক ওহী-ইলহাম প্রাপ্ত হয়ে আহমদীয়া জামাত নামে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের এক সংগঠন স্থাপন করতঃ মিথ্যা, শির্‌ক, বি'দাত মিটাবার কাজে রত হয়ে বহুধা বিভক্ত মুসলমান জাতিকে একতাবদ্ধভাবে পরস্পর ভাই-ভাইরূপে মিলিত হয়ে চলার আহ্‌বান জানালেন, তখনই আলেম-ওলামা ও মুফতী সাহেবগণ তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠলেন। এমন কোন মিথ্যা, ছল, বল, কল কৌশল অবশিষ্ট নেই যা প্রয়োগ করতে তাঁর বিরুদ্ধে বিন্দু পরিমাণ ত্রুটি করেছেন তারা। তাঁকে ইংরাজ জাতির দালাল, বৃটিশের লাগানো চারা গাছ ইত্যাদি বলা হয়েছে, অথচ তিনি যখন অকাট্য যুক্তি ও দলিল-প্রমাণাদি দ্বারা ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানদের খোদার পুত্র খোদা যীশু (ঈসা আঃ)-এর মৃত্যু সাব্যস্ত করতঃ কাশ্মীরে তাঁর কবর দেখিয়ে খৃষ্টানদের ক্রুশীয় মতাবাদকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করলেন, সেই অবস্থায় জনৈক মুফতী সাহেব হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে তার পুস্তকে লিখেন, "হযরত ইসা (আঃ)-এর উপর তাহার অপবাদের তূণ শূন্য করিয়া দিয়াছে তাঁহাকে এমন অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিয়াছে যে, তাহা শ্রবণ করিয়া কোন মুসলমানই সহ্য করিতে পারে না।" প্রশ্ন এই যে, মুফতী সাহেবের নবী কে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) না কি খৃষ্টানদের খোদার পুত্র খোদা যীশু (ঈসা আঃ) ? হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) হযরত ঈসা (আঃ)-কে গালালাগ দেন নি। যিনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত একজন নবী ছিলেন। যিনি খোদার পুত্র খোদা বলে দাবী করেন নি। হযরত মির্যা গোলাম (আঃ) যদি খৃষ্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী তাদের খোদার পুত্র খোদা যীশু (ঈসা আঃ)-কে গালাগাল দিয়েও থাকেন তাতে মুফতী সাহেবের গায়ে আগুন ধরার কারণ কি ? তিনি কি খৃষ্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী যীশু (ঈসা আঃ)-কে খোদার পুত্র খোদা বলে বিশ্বাস করেন ? তা না হলে গায়ে এত জ্বালা পালা ধরবে কেন ? খৃষ্টান পাদ্রীগণ যখন হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর পূত-পবিত্র দেহে কলংকের কালিমা লেপনের প্রয়াসে পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করে তখন মুফতী সাহেবদের কলম ভোঁতা হয়ে যায়, আরামে শুয়ে ঘুমের ঘোরে অচেতন অবস্থায় বেহেশ্‌তে যাওয়ার স্বপ্নে বিভোর থাকেন। তাই পাক কালামে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, "যখন ইবনে মরিয়মের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, তখন দেখ তোমরা [হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর)] জাতি উহাতে কীরূপ চেঁচামেচি করতে থাকে" (সূরা যুখরুফ)। এবার মুফতী সাহেবগণ হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) কি বলেছেন তা একটু মনোযোগ সহকারে শুনুন ঃ

"আমার আপত্তি সেই যীশুর সম্বন্ধে যে ঈশ্বরত্বের দাবী করে, সেই পবিত্র নবীর সম্বন্ধে নহে, যাঁহার কথা কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে" (তবলীগে রিসালাত ৬ষ্ঠ খন্ড ৩২ পৃঃ)। "আমি সেই সত্য যীশুকে পবিত্র ও সম্মানিত বলিয়া জানি এবং মান্য করি যিনি ঈশ্বরত্বের দাবী করেন নাই, ঈশ্বর পুত্র হওয়ার দাবীও করেন নাই এবং যিনি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আগমন সংবাদ দিয়াছিলেন ও তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন" (নূরুল কুরআন ২য় খন্ড ১৩ পৃঃ)।

পরিশেষে প্রার্থনা করি সত্যকে বুঝার এবং তা গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ্‌তাআলা সকলের হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত করে দিন, আমীন।

– সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

সহস্র সহস্র মুসলমান আহমদীয়ত গ্রহণ করছে কেন ?
পাকিস্তানে কুফুর বাজীর ফ্যাক্টরী সারা দুনিয়ায় আহ্‌মদীদিগকে মযলুম বানিয়েছে

কবির ভাষায় বলা যায়, যালেমের যুলুম, আর জাহেলের নির্যাতন এ দুয়ে মিলে করে সত্যের নির্বাচন।

"জা আল্ হাক্‌কু ওয়া যাহাকাল বাতেল-ইন্নাল বাতেলা কানা যাহূকা" (আল্ কুরআন)

পাকিস্তানের একজন সুচিন্তাশীল-ভদ্র মহিলা মুনা জ্যেরা নক্‌ভী সাহেবার একটি প্রবন্ধ লাহোর থেকে 'হাপ্তে রোজ মিডিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশকাল, ১৬/১১/৯৪ইং। উক্ত প্রবন্ধের একাংশ জামাতে আহমদীয়া রাবওয়া কর্তৃক মাসিক আনসারুল্লাহ্ ফেব্রুয়ারী '৯৫, সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তিনি তার প্রবন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, এ সময় অনাকাঙ্ক্ষিত এমন এক ব্যাধি দেশে বিরাজ করছে যা দেশ-প্রেমিক জনগণের কাম্য নয়। এই ব্যাধি হচ্ছে সাম্প্রদায়িক ব্যাধি। এই ব্যাধির চিকিৎসা ক্ষেত্রে সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। শুধু ব্যর্থতাই নয়, বরং চরম ব্যর্থতা। এই সাম্প্রদায়িকতার যুদ্ধে কতক আলেমে দীনকে (ধর্মীয় আলোকে) নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং অনেক পরিবারের প্রদীপ নিভিয়ে ফেলা হয়েছে অনেক দম্পতির সোহাগ কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে বিধবা বানিয়েছে। সহস সহস্র এতীম শিশুদের ভবিষ্যত অন্ধকার করা হয়েছে। পাকিস্তানে এই সাম্প্রদায়িক ব্যাধি এক সুপরিকল্পিত অনাহূত বিষয় তা আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃত হয়েছে।

এই ব্যাধির চিকিৎসায় পাঞ্জাব সরকারের দায়ীত্বশীল বিভাগও ব্যর্থতার ঘোষণা দিয়েছে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, এই সাম্প্রদায়িক সরকারই তা লালন করছে এবং সরকারের ছত্র ছায়ায় তা হচ্ছে। এ ব্যাধিকে ভিত্তি করে আরও অনেক মূল্যবান প্রাণ আগামীতেও বিসর্জিত হতে থাকবে। বহির্দেশের ইঙ্গিতে ধর্মের নামে ভবিষ্যতেও সাম্প্রদায়িকতার বাতাসদাতারা তাদের জীবন নিয়ে খেলা করতে থাকবে। সরকার ও (রাষ্ট্র) সংকল্প গ্রহণ করেছে যে, সাম্প্রদায়িকতার চিকিৎসার নেপথ্যে নাশকতার রক্ষামূলক কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা–তাদের ইপ্সিত খেলা খেলতেই থাকবে। এই ব্যাধিকে দুরারোগ্য করার উদ্দেশ্যে বিদেশী এজেন্ট ও শক্তি-সমূহ রীতিমত কাজ করে যাচ্ছে। চিন্তাবিদগণের মতে কাদিয়ানীরা ঘৃণার যোগ্য। কিন্তু তাদেরকে যখন সংখ্যালঘু ঘোষণা করা হয়, তখন তো তারা হয় মযলুম। যখন না কি শিয়া-সুন্নী ঝগড়া এক চরম আকার ধারণ করে এবং এমন এক পর্যায়ে পৌছে যে, আজ পর্যন্ত সত্য-মিথ্যা অথবা যালেম-মযলুম সনাক্ত করা হয় নি। কাদিয়ানীদিগকে সংখ্যালঘু ঘোষণা দেওয়ার পর খতমে নবুওয়ত নামে আরেক আন্দোলনের সূচনা করা হয়। আলেমরা তখন বড় লম্ফ-ঝম্ফ করতে শুরু করে। এভাবেই এক কুফুরবাজির ফ্যাক্টরী চালু করা হয়। এর ইশারাতে কতক নিষ্পাপ ব্যক্তির রক্ত ঝরানো হয়। ইহা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য যে, যাদেরকে ইসলামের দায়রা (গন্ডি) থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, তারা তো তাদের নেতৃস্থানীয়

ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণকে সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। কোন ব্যক্তিই এ কথা অস্বীকার করতে পারে না যে, যারা নিয়ম অনুযায়ী শীর্ষস্থানীয় ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে সম্মান প্রদর্শন করতে জানে তারা অবশ্যই তাদের জামাত বা সংগঠনকে মজবুত ভাবে। আমাদের ওলামাগণ দু'টি কর্মের জন্য জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারছে না ঃ এক তাদের কার্যকলাপ নিছক লোক দেখানো অপর দিকে শুধু দোকানদারী এবং প্রদর্শনের। এই দোকানদারিত্বের কারণে জনগণের আস্থা তো অর্জন করতে পারেই নি বরং আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে একে অপরকে কাফের ফতুয়া প্রদানের ফলে সব চাইতে বেশী লাভবান হয়েছে কাদিয়ানীরা। শত বছরেও যা তারা অর্জন করতে পারত না, তা গত কয়েক বছরে তারা অর্জন করেছে।

কয়েক বছর আগের কথা মির্যা নাসের আহমদের ইন্তেকালের পর আহমদীরা মির্যা তাহের আহমদকে খলীফা মনোনীত করেন। জুলফিকার আলী ভুট্টোর সরকার তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করে। তখন তারা শুধু রাব্ওয়াতেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর দেশের অন্যান্য স্থানে মাঝে মাঝে দু'এক জন কাদিয়ানী দেখা যেত। জেনারেল জিয়াউল হকের সরকারের আমলে এক ধর্মীয় আলেম আসলাম কুরাইশীর ছিনতাই ঘটনা সামনে আসে এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রক্তপাত ঘটানো হয়। আহমদীরা তখন অভিযোগ করে যে, তাদের জান-মাল ও ধন-সম্পদের হেফাযতের কোন ব্যবস্থাই সরকার গ্রহণ করে নি। পূর্ণ নিরাপত্তার অভাব দেখা দিলে পর জামাতে আহমদীয়ার নেতা (ইমাম) মির্যা তাহের আহমদ এই অভিযোগ সঙ্গে নিয়ে বহির্বিশ্বে চলে যেতে বাধ্য হয়।

মির্যা তাহের আহমদ দেশ ত্যাগ করার পর মাওলানা আসলাম কুরাইশীর ছিনতাইয়ের ভূয়া ড্রামার নাটকীয় ঘটনা দেশ সমক্ষে উন্মোচন হলে জনগণ আশ্চর্য হয়ে যায়। এই মাওলানা আসলাম কুরাইশী যখন সহী সালামতে আত্মপ্রকাশ করে তখন ষড়যন্ত্রের মূল বিষয় ফাঁস হয়ে পড়ে। আর এদিকে কাদিয়ানীরা সকল অপবাদ থেকে নির্দোষ প্রমাণিত হয়। দৃশ্যতঃ যাদের তবলীগের সকল পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল, আজ তারা সারা দুনিয়ায় নিজেদের "মযলুম" বলে প্রমাণ করতে সফল হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, মানুষ কখন মযলুম হয়, যখন যালেমের যুলুম হয়। (যারা যুলুম করে তারা হয় যালেম এবং যাদের উপর যুলুম করা হয় তারা হয় মযলুম–অনুবাদক)। জামাতে আহমদীয়ার নেতা মির্যা তাহের আহমদ একজন বিচক্ষণ ও সচেতন ব্যক্তি। যখন তিনি পাকিস্তানে ছিলেন, তখন আহমদীদের কতক কেন্দ্র সারা দুনিয়ায় কাজ করছিল। আজ রাবওয়া থেকে বহিষ্কার হওয়ার পর এই বহিষ্কৃত ব্যক্তি সারা দুনিয়ায় উড়ছে। এখন দুনিয়ার সব ক'টি দেশে কম বেশী কাদিয়ানী পাওয়া যাবে। বাস্তবে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই (রাষ্ট্র) কাদিয়ানীদিগকে আশ্রয় দিতে আগ্রহী। আমাদের আলেমদের সম্পর্কে খ্যাত যে, বহির্বিশ্বে তবলীগের কর্মসূচীতে সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে একে অপরের কাজে হস্তক্ষেপ করছে এবং দলে উপদলে বিভক্তি সৃষ্টি করে যাচ্ছে। ইহার বিপরীতে আহমদীয়া জামাতের মুবাল্লেগগণ নিজেদের শিক্ষা বিস্তার করে যাচ্ছেন এবং এ বিষয়ে **কাউকে বা কোন সম্প্রদায়কে নিশানা বানাচ্ছেন না।**

একদিকে মুসলমান ওলামারা সাম্প্রদায়িকতার কর্দমে আট্কা পড়ে আছে। অপর দিকে কাদিয়ানীরা তাদের মহব্বত ভরা তবলীগ দ্বারা মানুষকে তাদের দলে টানছে। এক সময় কাদিয়ানীরা পাকিস্তানে রেডিও ষ্টেশন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল কিন্তু আজ জামাতে আহমদীয়ার নেতা প্রযুক্তির সাহায্যে সারা দুনিয়ায় প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। পাকিস্তানে এই জামাত সব চাইতে সুসংগঠিত, তাই তারা তাদের কার্যসূচী বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। পাকিস্তানের উপাসনালয়সমূহে মির্যা তাহের আহমদের খেতাব (বক্তৃতা) ডিস এন্টিনার মাধ্যমে রীতিমত দেখানো ও শুনানো হচ্ছে। আহমদী যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণী, ও বুযর্গ তারা সুসম্পর্ক এবং বন্ধুত্ব দ্বারা মুসলমান যুবকদেরকে তাদের উপাসনালয়ে নিয়ে যায় এবং তাদেরকে মির্যা তাহের আহমদের আকর্ষণীয় বক্তৃতা শুনানো হয়। মির্যা তাহের আহমদের বক্তৃতাসমূহ যাদুর ন্যায় কাজ করছে।

এই কারণেই মুসলমান যুবকরা অনেকেই আহমদীয়তের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। তাছাড়া অনেক আহমদীর ভদ্রসুলভ ব্যবহারের কারণে তাদের পক্ষে যুবকদেরকে কথা বলতেও শুনা যায়। এভাবেই আহমদীয়তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। চিন্তা করলে অবশ্য বিস্মিত হতে হয় যে, এক সময় স্বয়ং মির্যা তাহের আহমদ এক সাক্ষাতে আমাকে বলেছিলেন, আমি আমার জীবনেই দেখছি যে, আহমদীরা সংখ্যালঘুর পরিবর্তে সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত হচ্ছে। আমি আরও এক ইনকিলাব দেখতে পাচ্ছি, যা পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ ধারণা করতে পারবে না। আজ এই ইনকিলাবের কথা মির্যা তাহের আহমদকে তার বক্তৃতায় বলতে শুনা যায়। এই বক্তৃতা পাকিস্তানের শত শত, হাজার হাজার নহে বরং লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতি জুমুআর দিন শ্রবণ করে থাকে। একজন আহমদী যুবক স্বাচ্ছন্দ্য জীবন যাপনের সাথে সাথে সারা দুনিয়ার সাথে আহমদীয়তের সম্পর্ক বজায় রাখছে। শুধু অমুসলিমই নয় বরং পাকিস্তানী এবং হিন্দুস্থানী মুসলমান এবং অমুসলমান যুবকেরাও আহমদীয়ত গ্রহণ করছে। এমন কি অন্য দেশেও তারা সংগঠন স্থাপন করছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যাদের জন্য রাবওয়ার মাটি সংকীর্ণ করে দেয়া হয়েছিল, আজ তারা সারা দুনিয়ায় এক শক্তিতে বিস্তৃতি লাভ করছে। মির্যা তাহের আহমদ এখন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। এ দিকে আমাদের ওলামারা নিজ নিজ মসজিদ-মাদ্রাসা নিয়ে ব্যস্ত এবং তারা নিজেদের মধ্যে আপোষে লড়ছে। কুফুরী ও ইসলামের যুদ্ধ মনে করে একে অপরের রক্ত নিয়ে হোলি খেলছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও একটি দল হিসেবে আহমদী সব চাইতে বেশী সুসংগঠিত। আহমদীদের দাবী হচ্ছে যে, তাদের তবলীগের সফলতা লাভের বৈশিষ্ট্য আমলের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তারা অ-আহমদীদের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করে থাকে। ফলে দুস্থ, অসহায় মানুষ তাদের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। সরকারী কর্মচারী-কর্মকর্তাদের মধ্যে এমন লোক খুব কম কাদিয়ানী রয়েছে যাদের মধ্যে চারিত্রিক দোষ পাওয়া যায়, যা সরকার বিরোধী হয়। এই কারণেই তারা তাদের সহকর্মী বা সাথীদের ঘৃণার পাত্র নয় অর্থাৎ তারা সকলের নিকট ভালবাসার পাত্র হয়।

ভাষান্তর ঃ **শেখ হেলাল উদ্দীন আহমদ**

ওয়াকফে নও মুজাহিদের সাথে পরিচিত হোন

নাম ঃ মুনাদিল শাফাত , ওয়াকফে নও নং ১৮০৮ বি
পিতা ঃ মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান , মাতা ঃ আমাতুল শাফী জাকিয়া
নানা ঃ মির্যা আলী আকন্দ, ঠিকানা ঃ রূপনগর, মীরপুর, ঢাকা।

আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ কৃপায় আহমদীয়া মুসলিস জামাত পটুয়াখালী মসজিদে গত ২৫-৬-৯৯ইং তারিখ শুক্রবার বরিশাল-পটুয়াখালী অঞ্চলের ১ম ওয়াকফে নও ও মাতা- পিতাগণের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী সাহেব উপস্থিত ছিলেন। এতদ অঞ্চলের সকল ওয়াকফে নও সন্তান ও মাতাপিতাগণ বিনা ব্যতিক্রমে উপস্থিত থাকেন।

বিভাগীয় প্রথম ওয়াকফে নও সম্মেলন

খুলনা বিভাগের প্রথম বিভাগীয় ওয়াকফে নও সম্মেলন আহমদীয়া মুসলিম জামাত খুলনায় ১৮-০৬-৯৯ইং রোজ শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়। ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী সাহেব বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এতে বক্তব্য রাখেন জনাব শামসুর রহমান, প্রেসিডেন্ট, খুলনা জামাত, জনাবা দীনা নাসরীন (বেবী), আমাতুস শেরা (মুক্তি), জনাব আবূ বকর, মুহিবুল্লাহ, জি, এম, মতিয়ার রহমান প্রমুখ। সভায় ওয়াকফে নও সন্তান ১০ জন, পিতা ৯ জন মাতা ১০ জন এবং অন্যান্য ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

বিঃ সেঃ ওয়াকফে নও, খুলনা বিভাগ

মহান সীরাতুন্নবী (সঃ) দিবস পালন

গত ১২ই রবিউল আউয়াল (২৭শে জুন '৯৯) বাংলাদেশের জামাতগুলোতে অতি শান-শওকত ও ধর্মীয় গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে খাতামান্নবীঈন বিশ্ব-নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতবা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মহান ও বিরাট জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা ও সভা সম্মেলনের মাধ্যমে সীরাতুন্নবী দিবস পালন করা হয়। এ পর্যন্ত যেসব জামাত ও সংগঠন থেকে খবর পাওয়া গেছে তারা হলেন ঃ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, তেজগাঁও, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, দুর্গারামপুর, খুলনা, কুমিল্লা, ঘাটুরা, বিষ্ণুপুর, বগুড়া, তারুয়া, তেরগাতি, সুন্দরবন,পটুয়াখালী (কাউনিয়া হালকা) আহমদনগর, সরাইল জামাত এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্‌, ঢাকা।

– আহমদী বার্তা

দৃষ্টি আকর্ষণ

২৫তম (রজত-জয়ন্তী) তালীম-তরবীয়তী ক্লাস '৯৯-এর পূর্ব নির্ধারিত তারিখ অনিবার্য কারণে পরিবর্তন হয়ে আগামী ১৩ই আগষ্ট হতে ২৪শে আগষ্ট '৯৯ পর্যন্ত পূর্ব-নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাল্লাহ্‌। উক্ত মহতী ক্লাসের সার্বিক কামিয়াবীর জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন করছি এবং এতে আতফাল, খোদ্দাম ভাইদের বেশী বেশী অংশগ্রহণের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নাসের আহমদ
সেক্রেটারী
২৫তম তালীম-তরবীয়তী ক্লাস-'৯৯

রিজিয়নাল কর্মশালা

আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ ফযলে খুলনা-বরিশাল রিজিয়নের ১৯৯৯-২০০০ সালের রিজিয়নাল কর্মশালা গত ২৫/০৬/৯৯ইং শুক্রবার খুলনাস্থ দারুল ফযল মসজিদ প্রাঙ্গণে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। খুলনাসহ স্থানীয় মজলিস, জেলা মজলিস ও রিজিয়নাল মজলিসের সর্বমোট ২২ (বাইশ) জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

দোয়ার এলান

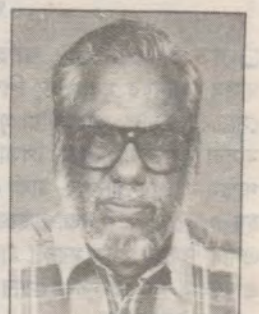

World University Games এ অংশ গ্রহণের জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা বিভাগের পরিচালক জনাব আ, স, আ, জহুরুল হোসেন ০২-০৭-৭৭ তারিখে বৃটিশ এয়ারযোগে স্পেন যাবেন। তিনি বাংলাদেশ এ্যাথলেটিক দলের ম্যানেজার হিসাবে যোগদান করবেন।

জনাব জহুরুল হোসেন ময়মনসিংহ নিবাসী আহমদীয়া কটেজ, ৪৬ বাউন্ডারী রোড, মরহুম আবুল হোসেন সাহেবের পুত্র। জনাব হোসেন দুই কন্যা সন্তানের জনক। বড় মেয়ে রাশেদা জহুরা একটি কলেজের প্রভাষক এবং ছোট মেয়ে মাসুদা মোহসেনা মিটফোর্ড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্টারনী ডাক্তার। তিনি সকলের দোয়াপ্রার্থী।

মাহবুব হোসেন,
ধানসিড়ি রেস্তোঁরা

কৃতী ছাত্র-ছাত্রী

❑ আমাদের তৃতীয়া কন্যা আমাতুল মুজীব (খুশী) বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ থেকে মানবিক বিভাগে চলতি এস. এস. সি পরীক্ষায় রাজশাহী বোর্ডে মেয়েদের মধ্যে দশম স্থান পেয়েছে (আল্ হামদুলিল্লাহ্‌)। সে ইংরেজীসহ ৫টি বিষয়ে লেটার মার্কস পেয়েছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৮০৩। আমরা তার জন্য সবার কাছে দোয়াপ্রার্থী।

অধ্যাপক রাজীব উদ্দিন আহমদ
প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বগুড়া

❑ আমার প্রথম ছেলে জামাল উদ্দিন আহমদ সৌরভ, এবারের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীন মতিঝিল মডেল স্কুল হতে আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ ফযলে বিজ্ঞান বিভাগে গণিত, উচ্চতর গণিত, জীববিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা ও ধর্ম শিক্ষা ৫টি বিষয়ে লেটার সহ স্টার মার্ক পেয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৮০৩। তার ভবিষ্যৎ সাফল্যের জন্য সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী।

সালাহ উদ্দিন আহমদ , ঢাকা

❑ খুলনা জামাতের খাদেম আজিজ আহমদ (আসিফ) ১৯৯৯ সালে অনুষ্ঠিত এস, এস, সি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে ৭টি লেটার সহ মোট ৮৯৭ পেয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। উল্লেখ্য, সে ২ মার্কের জন্য মেধা তালিকায় স্থান লাভ করতে পারেনি। সে খুলনা জামাতের মংলা হালকার প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল হাই সাহেবের পুত্র। তার ভবিষ্যত দীনি এবং জাগতিক উভয় ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের জন্য জামাতের সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী।

মোঃ আব্দুল হাই , প্রেসিডেন্ট
মংলা হালকা, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনা

বৃহত্তর রংপুর জেলার কায়েদ সম্মেলন

বিগত ১৮-০৬-৯৯ইং তারিখে রোজ শুক্রবার মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া বৃহত্তর রংপুর জেলার কায়েদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্‌। উক্ত অনুষ্ঠানে ৮টি মজলিসের মধ্যে পাঁচটি মজলিসের প্রতিনিধি কায়েদগণ ১২ জন উপস্থিত ছিলেন।

জেলা মোতামাদ

বৃহত্তর ঢাকা জেলার ২য় কায়েদ সম্মেলন

গত ১৮/০৬/৯৯ইং রোজ শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ঢাকা জেলা পর্যায়ে দ্বিতীয় কায়েদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১০টি মজলিসের মধ্যে ৮টি মজলিসের স্থানীয় কায়েদ, নাযেম মাল ও জেলা আমেলার নাযেমগণসহ মোট ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

ডাঃ শরীফুল হাকীম
জেলা কায়েদ, বৃহত্তর ঢাকা মজলিস

শুভ বিবাহ

❑ গত ০৪-০৬-৯৯ইং তারিখ রোজ শুক্রবার জনাব শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম, জুনিয়র মুবাল্লেগ, পিতা-জনাব মোহাম্মদ সাহাব উদ্দিন, ন্যাশনাল সেক্রেটারী মাল, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর সাথে মোসাম্মৎ মাসুদা সুলতানা ভেনাস পিতা-জনাব মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, ১৯৮/১-পশ্চিম মণিপুর, মীরপুর, ঢাকা এর শুভ-বিবাহ দারুত তবলীগ মসজিদে সম্পন্ন হয় ৫০,০০১/= (পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা দেন মোহর ধার্যে। বিবাহের এলান করেন সদর মুরব্বী মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব। এ বিবাহ বা-বরকত হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর খেদমতে দোয়ার আবেদন করা হচ্ছে।

❑ গত ১১-০৬-৯৯ইং তারিখ মোসাম্মৎ সাদিয়া সুলতানা পিতা-জনাব মোহাম্মদ আবদুল হান্নান, গ্রাম-মুসুয়া, থানা-কটিয়াদী, জেলা-কিশোরগঞ্জ এর সাথে জনাব আবুল বাশার, তালশহর, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া শুভ বিবাহ ৫০,০০১/= টাকা দেন মোহরে সম্পন্ন হয়। বিবাহের এলান করেন মোয়াল্লেম আবুল কাশেম আনসারী কন্যার পিত্রালয়ে। এই বিবাহ বা-বরকত হওয়ার জন্য বন্ধুগণের নিকট দোয়ার আবেদন করা হচ্ছে।

❑ গত ১৭-০৬-৯৯ইং তারিখ মোসাম্মৎ ফেরদৌস আরা বেগম পিতা-জনাব মোহাম্মদ আমীর আলী, আনন্দপুর, জেলা-কুমিল্লা এর সাথে এস, এম, শামীম, পিতা-মোহাম্মদ নূর মিয়া, ঘাটুরা, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৩০,০০১/= (ত্রিশ হাজার এক) টাকা দেন মোহরে বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিবাহের এলান করেন জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিস, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত-কুমিল্লা নন্দনপুর মসজিদে। এই বিবাহ বা-বরকত হওয়ার জন্য বন্ধুগণের নিকট দোয়া আবেদন করা হচ্ছে।

গত ৯-৭-৯৯ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মোসাম্মৎ ফাহিমা খাতুন, পিতা-জনাব মোহাম্মদ মুর্তুজা আলী, গ্রাম-ফুলতলা (আহমদনগর), পোঃ ধাক্কামারা, থানা ও জেলা- পঞ্চগড় এর সাথে জনাব মোহাম্মদ আবদুল বারিক সরকার, পিতা- জনাব মোহাম্মদ আবু সামা সরকার, গ্রাম-বলারদিয়ার পোঃ + থানা-সরিষাবাড়ী, জেলা-জামালপুর -এর শুভ বিবাহ ৫০,০০১/= টাকা দেন মোহরে সম্পন্ন হয়। এই বিবাহের এলান করেন সদর মুরব্বী মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।বিবাহ বা-বরকত হওয়ার জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

আব্দুল কাদির ভুইয়া, সেক্রেটারী, রিশ্‌তানাতা

❑ রংপুর-মাহীগঞ্জ দেওয়ান টুলীস্থ জনাব খুরশীদ আহমদ (বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ জামাত)-এর ৩য়া কন্যা হামিদা আক্তার মুন্নির সাথে মরহুম আনোয়ার আহমদ খান চৌধুরীর ১ম পুত্র জনাব নাভিদ আহমদ খান চৌধুরীর, নাটোর চৌধুরী বাড়ী (বর্তমানে ঢাকা জামাত) ১,৫০,০০১/= দেন মোহর ধার্যে গত ১৮-০৬-৯৯ইং ঢাকা দারুত তবলীগ মসজিদে বিবাহ সু-সম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী। নব দম্পত্তির বিবাহিত জীবন যেন সুখী ও শান্তিময় হয় তার জন্য সকলের নিকট খাসভাবে দোয়ার অনুরোধ করা হলো।

খালেদ মাহমুদ সুজন
নারায়ণগঞ্জ

বিশেষ দোয়ার এলান

❑ আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের প্রাক্তন নায়েব ন্যাশনাল আমীর এবং পাক্ষিক আহমদীর সম্পাদক জনাব মকবুল আহমদ খান সাহেব বার্ধক্যজনিত কারণে দীর্ঘদিন থেকে অসুস্থ আছেন।

❑ বর্তমান নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২য় জনাব মোহাম্মদ শামসুর রহমান সাহেবও পোষ্ট অপারেশন অবস্থায় ক্লিনিকে খুবই অসুস্থাবস্থায় আছেন। তাঁদের উভয়ের আশু ও পূর্ণ রোগমুক্তির জন্যে সকলের নিকট বিশেষভাবে দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

ঢাকা জামাতের আমীর জনাব আফজাল আহমদ খাদেম সাহেবের হার্টের বাইপাস অপারেশন ১৪/৭/৯৯ বুধবার হয়েছে। তাঁর আশু আরোগ্য লাভের জন্য খাস দোয়ার অনুরোধ রইল।

– সহকারী সম্পাদক

সংশোধনী

পাক্ষিক আহমদীর ৩০শে জুন '৯৯ সংখ্যায় 'শানে মুহাম্মদ আরাবী (সঃ)' শীর্ষক কবিতাসমূহের পনর নম্বর কবিতাংশের ২য় লাইনের শেষে 'কানে' শব্দটিকে 'খনিতে' পাঠ করতে হবে। তেমনিভাবে মোহতরম শাহ মুস্তাফিজুর রহমান সংকলিত ও অনূদিত পুস্তক - 'রসূলে আজম মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ)-এর জ্যোতির্ময় গৌরব ও মহিমা'-এর ১৬৪ পৃষ্ঠার একত্রিশ নম্বর কবিতার ২য় লাইনের 'কানে' শব্দটিও 'খনিতে' পাঠ করতে হবে। **– সহকারী সম্পাদক**

বন্যায় '৫৪ সাল থেকে ক্ষতি ৭০ হাজার কোটি টাকা ॥ মৃত্যু ৭ হাজার

❑ ৮ জুলাই '৯৯ ॥ ১৯৫৪ সাল থেকে বাংলাদেশে বন্যায় সরকারী হিসেবে ক্ষতির পরিমাণ ১৪২৪ কোটি ডলার (প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকা) এবং মৃতের সংখ্যা ৭ হাজারের বেশী।

জনসংখ্যায় বাংলাদেশের ৯ম স্থান

❑ ৪ জুলাই '৯৯ ॥ জনসংখ্যায় বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান ৯ম এবং ২০১০ সালে ৭ম স্থানে থাকবে। বর্তমানে লোক সংখ্যা ১২ কোটি ৪৭ লাখ। ২০১০ সালে ১৫ কোটি ছাড়িয়ে যাবে।

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43,NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

TEL : 884724, 872220, 884076,Email-mhk@bdmail.net FAX: 880-2-883552

STAR

"WE EXPORT FROM HONG KONG, CHINA, KOREA, TAIWAN, THAILAND, SINGAPORE, JAPAN & U.K."

FABRICS & ACCESSORIES, JEANSPANT, T-SHIRT, JACKET, SCURT-TOPS, TIDES, SOCKS, SHOES, BLANKET, ELECTRONIC PRODUCTS, COMPUTER ACCESSORIES, TOYS ETC

CONTACT : **MD. SERAJUL ISLAM**

PACIFIC FASHION ENTERPRISE

FLAT-D3, 14/F, CHUNG KING MANSION

36-44 NATHAN ROAD, TST, KOWLOON, HONG KONG

TEL: 852-27214021 FAX: 852-23121073

AHMED TRADE INTERNATIONAL

Manufacturer : Drawstring, Tipping, Stopper, Cotton Twill Tape etc.

Dyer : we have a power dyeing house of our own.

with 100% Challanging guarantee of matching and colour fastness.

Office :
79, Hoseni Dalan Road
Dhaka-1211

Factory
36/D, Kakrail (1st Floor),
Dhaka-1000

Phone :
Off : 239013
Res : 804944

Mobile 017527771
Fax : 880-2-805350

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRDUCER OF QALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217

Phone : 414550, 9331306

লন্ডন জলসার বিশেষ বিশেষ প্রোগ্রামের ঝলক

তারিখ	লন্ডন সময়	বাংলাদেশ সময়	কর্মসূচী
৩০-৭-৯৯			
শুক্রবার	১১.৩০	৫.৩০ বিকেল	হুযূর (আইঃ)-এর জলসা গাহ্ পরিদর্শন
"	১২.০০–১২.৩০	৬–৬.৩০ বিকেল	জলসায় আগত বিদেশী প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার
"	১৩.০০	৭.০০ সন্ধ্যা	জুমুআর খুতবা প্রদান করবেন হুযূর (আইঃ)
"	১৫.২৫	৯.২৫ রাত্র	পতাকা উত্তোলন, তিলাওয়াত, নজম , **হুযূর (আইঃ) কর্তৃক জলসার উদ্বোধনী ভাষণ** প্রদান
৩০-৭-৯৯			
শনিবার	১০.০০	৪.০০ বিকেল	**জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন** আরম্ভ – বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভাষণ
"	১১.৩০	৫.৩০ বিকেল	তিলাওয়াত ও নজম
"	১১.৪৫	৫.৪৫ বিকেল	মহিলাদের জলসাগাহে হুযূর (আইঃ)-এর ভাষণ প্রদান
"	১৬.০০	১০.০০ রাত্র	**জলসার তৃতীয় অধিবেশন** তিলাওয়াত, নজম হুযূর (আইঃ)-এর দ্বিতীয় দিনের ভাষণ
১-৮-৯৯			
রবিবার	৭.০০	১.০০ দুপুর	**তৃতীয় অধিবেশন** তিলাওয়াত ও নজম
"	১০.০০	৪.০০ বিকেল	চতুর্থ অধিবেশনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভাষণ
"	১১.১৫	৫.১৫ বিকেল	হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) কর্তৃক আন্তর্জাতিক প্রশ্নোত্তর অধিবেশন
"	১৩.০০	৭.০০ সন্ধ্যা	আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন হুযূর (আইঃ)
"	১৬.০০	১০.০০ রাত্র	**শেষ অধিবেশন** তিলাওয়াত ও নজম হুযূর (আইঃ) কর্তৃক সমাপ্তি ভাষণ

(এম, টি, এ ইন্টারন্যাশনাল -এর সৌজন্যে) ❑ সংকলন ও অনুবাদ ঃ **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

বেলজিয়াম জামাতের ৭ম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্তাআলার অশেষ ফযলে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বেলজিয়ামের ৭ম বার্ষিক সালানা জলসা পরিবেশের মধ্য দিয়ে গত রবিবার শেষ হয়। ২৫, ২৬ ও ২৭শে জুন রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস্ এর "বায়তুস সালাম" কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত এই সালানা জলসায় হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি হিসাবে আহমদীয়া মুসলিম জামাত হল্যান্ডের আমীর মোহতরম হিবাতুন্ নুর সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সাথে হল্যান্ডের আরেকজন বিশিষ্ট আহমদী মোহতরম আব্দুল হামিদ সাহেব (এই দুজনই ডাচ্ আহমদী) উপস্থিত ছিলেন। তিনদিনের এই জলসায় মোট ৫টি পৃথক অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব আজিজ আহমদ ভাট্টি, আব্দুল হামিদ হল্যান্ড, এন, এ, শামীম, তওহীদুল হক, নাসির আহমদ সাহেব, মুনীর আহমদ ভাট্টি, মোজাফ্ফর আহমদ খান, ডাঃ ইদ্রিস আহমদ।

এছাড়া দু'টি তবলীগী অধিবেশনও অনুষ্ঠিত হয়। ফ্রেঞ্চ তবলীগী অধিবেশনে বেলজিয়াম, আফ্রিকান এবং আরবীয়ান মোট ৩৩ জন জেরে তবলীগ উপস্থিত ছিলেন। অতিথিবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন সদর মুরব্বী জনাব নাসির আহমদ সাহেব।

ডাচ্ তবলীগী অধিবেশনে বেলজিয়াম ও আফ্রিকান ১৮ জন জেরে তবলীগ অতিথি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে অত্র এলাকার মেয়রও উপস্থিত ছিলেন। অতিথিবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মোকাররম হিবাতুন নূর সাহেব ও আব্দুল হামিদ সাহেব।

বেলজিয়ামের ৭ম সালানা জলসায় প্রথম বারের মত বেলজিয়ামে অবস্থানরত বাংলাদেশী আহমদীদের জন্য একটি পৃথক "বাংলা অধিবেশন" অনুষ্ঠিত হয়।

হল্যান্ড থেকে আগত বাংলাদেশের কৃতী আহমদী কাওসার আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মাগফুর রহমান, সুললিত কণ্ঠে বাংলা নযম (খেলাফতের ডাক) পাঠ করেন জনাব রুস্তম আহমদ। অতঃপর "তবলীগের গুরুত্ব ও আমাদের দায়িত্বাবলী-এর উপর এন, এ, শামীম আহমদ এবং "বাংলাদেশী কৃতী আহমদীদের কুরবানী'র উপর জনাব তওহীদুল হক বক্তব্য পেশ করেন। অতঃপর সভাপতি সাহেবের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এন, এ, শামীম আহমেদ
(বেলজিয়াম)

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43,NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212
TEL : 884724, 872220, 884076,Email-mhk@bdmail.net FAX: 880-2-883552

STAR

"WE EXPORT FROM HONG KONG, CHINA, KOREA, TAIWAN, THAILAND, SINGAPORE, JAPAN & U.K."
FABRICS & ACCESSORIES, JEANSPANT, T-SHIRT, JACKET, SCURT-TOPS, TIDES, SOCKS, SHOES, BLANKET, ELECTRONIC PRODUCTS, COMPUTER ACCESSORIES, TOYS ETC

CONTACT : **MD. SERAJUL ISLAM**

PACIFIC FASHION ENTERPRISE
FLAT-D3, 14/F, CHUNG KING MANSION
36-44 NATHAN ROAD, TST, KOWLOON, HONG KONG
TEL: 852-27214021 FAX: 852-23121073

AHMED TRADE INTERNATIONAL

Manufacturer : Drawstring, Tipping, Stopper, Cotton Twill Tape etc.
Dyer : we have a power dyeing house of our own.
with 100% Challanging guarantee of matching and colour fastness.

Office :
79, Hoseni Dalan Road
Dhaka-1211

Factory
36/D, Kakrail (1st Floor),
Dhaka-1000

Phone :
Off : 239013
Res : 804944

Mobile 017527771
Fax : 880-2-805350

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRDUCER OF QALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

লন্ডন জলসার বিশেষ বিশেষ প্রোগ্রামের ঝলক

তারিখ	লন্ডন সময়	বাংলাদেশ সময়	কর্মসূচী
৩০-৭-৯৯ শুক্রবার	১১.৩০	৫.৩০ বিকেল	হুযূর (আইঃ)-এর জলসা গাহ্ পরিদর্শন
"	১২.০০-১২.৩০	৬-৬.৩০ বিকেল	জলসায় আগত বিদেশী প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার
"	১৩.০০	৭.০০ সন্ধ্যা	জুমুআর খুতবা প্রদান করবেন হুযূর (আইঃ)
"	১৫.২৫	৯.২৫ রাত্র	পতাকা উত্তোলন, তিলাওয়াত, নজম , **হুযূর (আইঃ) কর্তৃক জলসার উদ্বোধনী ভাষণ** প্রদান
৩০-৭-৯৯ শনিবার	১০.০০	৪.০০ বিকেল	**জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন** আরম্ভ - বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভাষণ
"	১১.৩০	৫.৩০ বিকেল	তিলাওয়াত ও নজম
"	১১.৪৫	৫.৪৫ বিকেল	মহিলাদের জলসাগাহে হুযূর (আইঃ)-এর ভাষণ প্রদান
"	১৬.০০	১০.০০ রাত্র	**জলসার তৃতীয় অধিবেশন** তিলাওয়াত, নজম হুযূর (আইঃ)-এর দ্বিতীয় দিনের ভাষণ
১-৮-৯৯ রবিবার	৭.০০	১.০০ দুপুর	**তৃতীয় অধিবেশন** তিলাওয়াত ও নজম
"	১০.০০	৪.০০ বিকেল	চতুর্থ অধিবেশনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভাষণ
"	১১.১৫	৫.১৫ বিকেল	হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) কর্তৃক আন্তর্জাতিক প্রশ্নোত্তর অধিবেশন
"	১৩.০০	৭.০০ সন্ধ্যা	আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন হুযূর (আইঃ)
"	১৬.০০	১০.০০ রাত্র	**শেষ অধিবেশন** তিলাওয়াত ও নজম হুযূর (আইঃ) কর্তৃক সমাপ্তি ভাষণ

(এম, টি, এ ইন্টারন্যাশনাল -এর সৌজন্যে) ❑ সংকলন ও অনুবাদ ঃ **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

বেলজিয়াম জামাতের ৭ম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্তাআলার অশেষ ফযলে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বেলজিয়ামের ৭ম বার্ষিক সালানা জলসা পরিবেশের মধ্য দিয়ে গত রবিবার শেষ হয়। ২৫, ২৬ ও ২৭শে জুন রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস্ এর "বায়তুস সালাম" কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত এই সালানা জলসায় হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি হিসাবে আহমদীয়া মুসলিম জামাত হল্যান্ডের আমীর মোহতরম হিবাতুন্ নুর সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সাথে হল্যান্ডের আরেকজন বিশিষ্ট আহমদী মোহতরম আব্দুল হামিদ সাহেব (এই দুজনই ডাচ্ আহমদী) উপস্থিত ছিলেন। তিনদিনের এই জলসায় মোট ৫টি পৃথক অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব আজিজ আহমদ ভাট্টি, আব্দুল হামিদ হল্যান্ড, এন, এ, শামীম, তওহীদুল হক, নাসির আহমদ সাহেব, মুনীর আহমদ ভাট্টি, মোজাফ্ফর আহমদ খান, ডাঃ ইদ্রিস আহমদ।

এছাড়া দু'টি তবলীগী অধিবেশনও অনুষ্ঠিত হয়। ফ্রেঞ্চ তবলীগী অধিবেশনে বেলজিয়াম, আফ্রিকান এবং আরবীয়ান মোট ৩৩ জন জেরে তবলীগ উপস্থিত ছিলেন। অতিথিবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন সদর মুরব্বী জনাব নাসির আহমদ সাহেব।

ডাচ্ তবলীগী অধিবেশনে বেলজিয়াম ও আফ্রিকান ১৮ জন জেরে তবলীগ অতিথি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে অত্র এলাকার মেয়রও উপস্থিত ছিলেন। অতিথিবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মোকার্রম হিবাতুন নূর সাহেব ও আব্দুল হামিদ সাহেব।

বেলজিয়ামের ৭ম সালানা জলসায় প্রথম বারের মত বেলজিয়ামে অবস্থানরত বাংলাদেশী আহমদীদের জন্য একটি পৃথক "বাংলা অধিবেশন" অনুষ্ঠিত হয়।

হল্যান্ড থেকে আগত বাংলাদেশের কৃতী আহমদী কাওসার আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মাগফুর রহমান, সুললিত কণ্ঠে বাংলা নযম (খেলাফতের ডাক) পাঠ করেন জনাব রুস্তম আহমদ। অতঃপর "তবলীগের গুরুত্ব ও আমাদের দায়িত্বাবলী-এর উপর এন, এ, শামীম আহমদ এবং "বাংলাদেশী কৃতী আহমদীদের কুরবানী'র উপর জনাব তওহীদুল হক বক্তব্য পেশ করেন। অতঃপর সভাপতি সাহেবের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এন, এ, শামীম আহমেদ
(বেলজিয়াম)

❑ ইউ কে জলসা '৯৮ ঃ অন্যান্যদের মাঝে আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ, জনাব এ কে রেজাউল করীম, সেক্রেটারী ওসীয়্যত এবং পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের আমীর মাশরেক আলী মোল্লা সাহেবকে দেখা যাচ্ছে।

❑ ৭ম সালানা জলসা, বেলজিয়ামের প্রথম দিবসের উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন বেলজিয়ামের আমীর জনাব হামীদ মাহ্‌মুদ শাহ্‌। এবং মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন সর্ববামে জনাব আব্দুল হামীদ সাহেব হল্যান্ডের অধিবাসী এবং ডানে হল্যান্ডের আমীর জনাব হিবাতুন্‌ নূর সাহেব।

❑ বাংলা অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন জনাব এন, এ, শামীম আহমদ (৭ম সালানা জলসা বেলজিয়াম, ২৫, ২৬ ও ২৭শে জুন)। মঞ্চে উপবিষ্ট অন্যান্যরা হলেন–জনাব আহসান হাবিব (ইনচার্জ বাংলা ডেস্ক) জনাব কাওসার আহমদ (হল্যান্ড) এবং জনাব নাসির আহমদ সাহেব (সদর মুরব্বী)

New Vol. No. 62 ❑ 1st Issue July 15, 1999 ❑ Tk. 10.00

Fortnightly **The AHMADI** রেজি ঃ নং-ডি, এ-১২

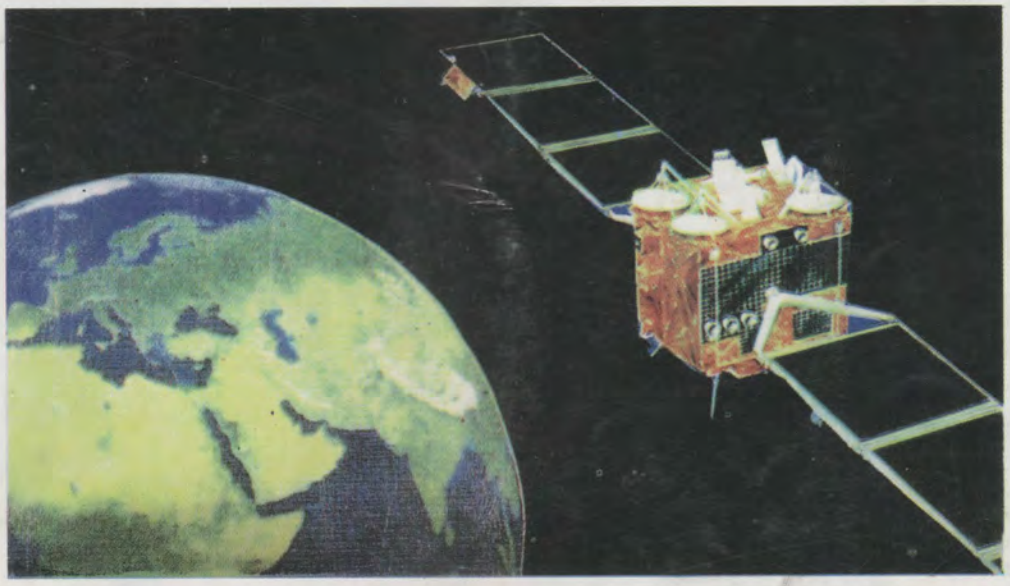

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

Muslim TV AHMADIYYA INTERNATIONAL

MTA AUDIO CHANNELS

* Main	: 6.50 MHz	* French	: 7.56 MHz
* English	: 7.02 MHz	* German	: 7.74 MHz
* Arabic	: 7.20 MHz	* Indonesian	: 7.92 MHz
* Bangla	: 7.38 MHz	* Turkee	: 8.10 MHz

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

এমটিএ অহোরাত্র দর্শক যার বিশ্বে সর্বত্র

MTA-এর নতুন কর্মসূচী

- প্রত্যহ তিনবার লেকামাআল আরব
- প্রত্যেক মঙ্গল ও বুধবার কুরআন ক্লাস
- প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার হোমিওপ্যাথি ক্লাস
- প্রত্যেক বুধবার বাংলা সার্ভিসে পুরাতন খুতবা প্রচার
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে প্রশ্ন-উত্তর অধিবেশনের বঙ্গানুবাদ
- এমটিএ-এর দর্শক-শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ প্রোগ্রামগুলো দেখতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬ টায় হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর খুৎবাহ শুনুন।

এমটিএ MTA : ৫৭° ইষ্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহাটস্। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মে: হা:।

আপনার বাড়ীতে এমটিএ MTA -এর সংযোগ নিন। নিজেকে ও পরিবারকে অবক্ষয়মুক্ত রাখুন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211

Phone : 9662703, 505272